দাম : পাঁচ টাকা

স্বস্তিকা

২৫ জুলাই - ২০১১, ৮ শ্রাবণ - ১৪১৮ ।। ৬৩ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা

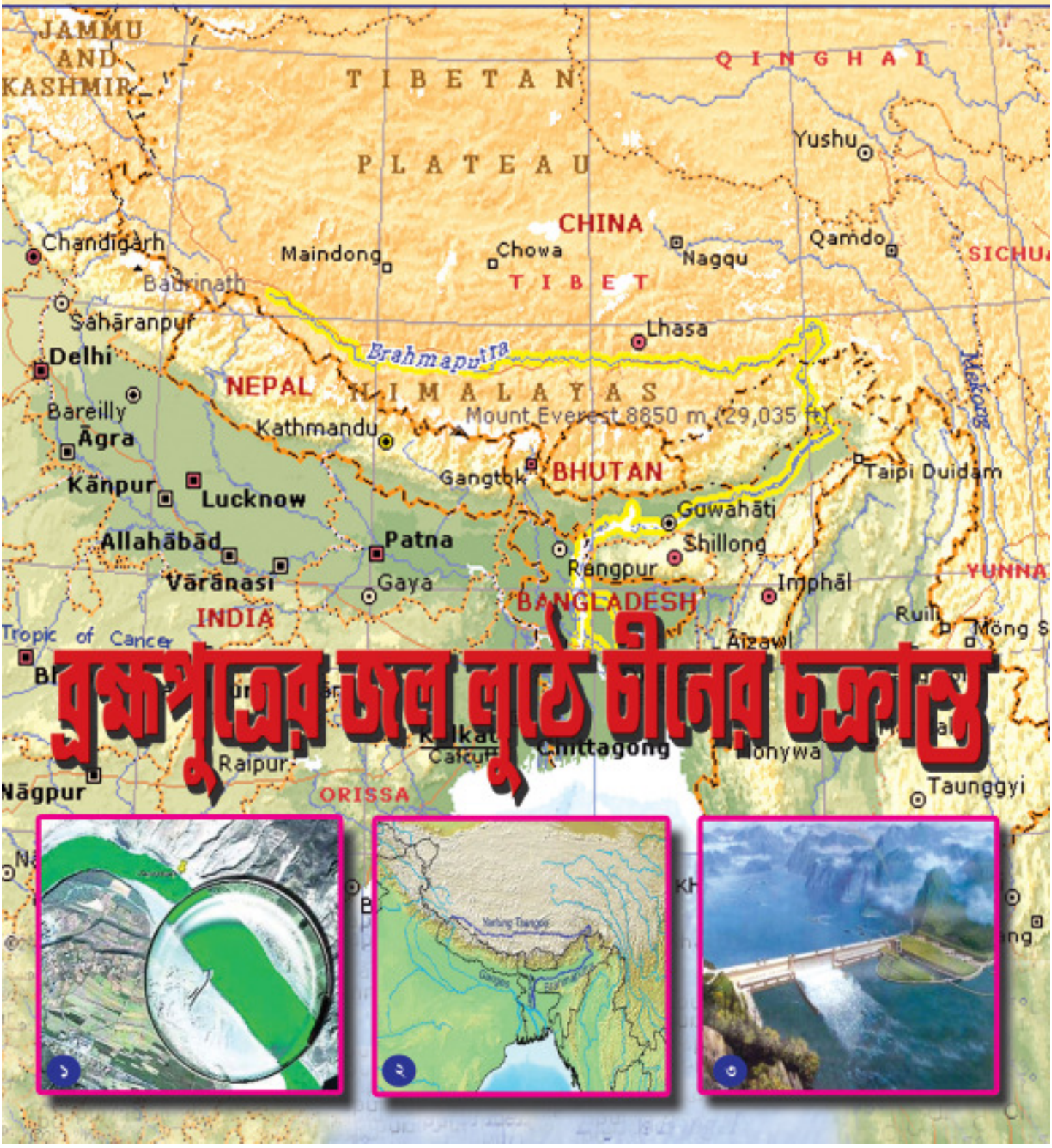

ব্রহ্মপুত্রের জল লুঠে চীনের চক্রান্ত

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑

সংবাদ প্রতিবেদন ❑

দিগ্বিজয়দের মতো 'হিজ মাস্টারস্ ভয়েস' মার্কা

সারমেয়দের কথায় কান না দেওয়াই ভাল ❑

রাজ্যের বিজয়ী ও পরাজিতদের অবস্থান কোথায়? ❑

কর্তৃত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠছে প্রধানমন্ত্রীর ❑ তারক সাহা ❑

ভগবান পদ্মনাভনের সম্পদ তাঁর নিজেরই ❑ রাম মাধব ❑

ব্রহ্মপুত্র নদের জল লুঠে চীনের চক্রান্ত ❑ অশোকানন্দ সিংহল ❑

চীনর ওপর চাই সদা-সতর্ক নজরদারি ❑ তারক সাহা ❑

সুবিশাল ব্রহ্মপুত্র ❑

ব্রহ্মপুত্র নিয়ে এত অনীহা কেন? ❑

হিন্দুত্বকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয় কোনও চিন্তাশীল ভারতীয়ের পক্ষেই ❑

কংগ্রেসের অপরিণামদর্শী রাজনীতি : পৃথক রাজ্যের দাবি আগুন ছড়াতে পারে ❑

ত্রিপুরায় বাম সরকারের বিপিএল কার্ড কেলেঙ্কারি ❑

ষোড়শ মহাজনপদ : পাঞ্চাল ও বৎস ❑

সাধক ও দস্যু ❑ নির্মল কর ❑

শৃঙ্গেরী, উডিপি ও ম্যাঙ্গালোর ভ্রমণ ❑ তরুণ কুমার পণ্ডিত ❑

বাংলার কিংবদন্তী নাট্য - সম্রাজ্ঞী সরযূবালা ❑ ইন্দিরা রায় ❑

অরুণা মুখোপাধ্যায় : আইনজীবী জীবনের ৫০ বছর পেরিয়ে এলেন ❑

সংখ্যালঘুত্ব ❑

অ্যাথলেটিক্সে অনাচার, তিরন্দাজেরা স্বপ্নের ফেরিওয়ালা ❑
জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ❑

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ❑ অন্যরকম : ❑ পুস্তক প্রসঙ্গ : ❑ চিঠিপত্র : ❑ ভাবনা-চিন্তা : ❑সমাবেশ–সমাচার : ❑ শব্দরূপ : ❑ চিত্রকথা :

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৩ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা, ৮ শ্রাবণ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ২৫ জুলাই - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

চীনের ব্রহ্মপুত্র নদেল জল লুঠ — ১৪-১৭

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Registration No.-Kol.RMS/048/2010-2012

LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT

L. No.-MM & P.O. / SSRM-KOL.RMS RNP-048/LPWP-028/2010-12

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মুম্বাইতে বিস্ফোরণ আরও কত বার?

গত ১৩ জুলাই ২০১১ মুম্বাইতে আবার বিস্ফোরণ হইয়া গেল। ১৯৯৩ সাল হইতে ২০১১ সালের ১৩ জুলাই পর্যন্ত মুম্বাইতে সন্ত্রাসী হানায় নিহত হইয়াছে ৭০০ জন ভারতীয়। ২০০৫ হইতে এই পর্যন্ত সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হইয়াছে ৩৭০ জন। জখমের সংখ্যা ১৫ হাজারের মতো। ১৯৯৩ সালের ১২ মার্চ মুম্বাইয়ের বুকে ঘটিয়াছিল ১১টি বিস্ফোরণ। ১৯৯৮ সালের ২৩-২৪ ও ২৭ জানুয়ারি শহরের রেল লাইন ও স্টেশনের ছয়টি স্থানে বিস্ফোরণ ঘটিয়াছিল। ২০০২ সালের ১৩ মার্চ মুম্বাইতে একটি ট্রেনে এবং ওই বছরই ২৫ আগস্ট জাভেরি বাজারের কাছে একটি ট্যাক্সিতে বিস্ফোরণ হয়। ২০০৬-এর ১১ জুলাই সাত মিনিটের মধ্যে বিস্ফোরণ হইয়াছিল সাতটি শহরতলির ট্রেনে। ২০০৮ এবং ২৬ থেকে ২৯ নভেম্বর সি এস টি, তাজ ওবেরয় ট্রাইডেন্ট সহ কয়েকটি স্থানে বিস্ফোরণ ও হামলা হইয়াছিল। বস্তুত আমাদের দেশের শাসককুলের অকর্মণ্যতা, অদূরদর্শিতা, কাপুরুষতা এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার জন্যই সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা বারবার ঘটিতেছে। দেশের শাসকবর্গ কিন্তু এই ঘটনায় বিচলিত বোধ করিতেছেন না এবং বারবার আক্রমণের ঘটনা ঘটিবার পরেও দিল্লির শাসকবর্গ এমন কোনও স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই যাহাতে সন্ত্রাস সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিক বন্ধ হইতে পারে। নাগরিকদের রক্ষা করিবার যোগ্যতা যে এই সরকারের নাই তাহা আজ সকলেরই উপলব্ধি হইয়াছে। আর দুর্নীতিতে মগ্ন একটি সরকারের সন্ত্রাসের হাত হইতে নাগরিকদের রক্ষা করাও সম্ভব নয়। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একারণেই বলিয়াছেন, কেন্দ্রের হাঁটুকাঁপানি মনোভাবের জন্যই সন্ত্রাসবাদীরা উৎসাহিত হইতেছে। এখনও পর্যন্ত কোনও হামলারই কিনারা করিতে পারেন নাই কেন্দ্রীয় সরকার। এই কিনারা করিতে না পারার জন্যই উৎসাহিত হইয়াছে সন্ত্রাসবাদীরা। মুম্বাইকাণ্ডের নায়ক কাসব জামাই আদরে কারাগারে দিন কাটাইতেছে। বিচারকদের ধমক দিতেছে, থুতু ছিটাইতেছে আর কেন্দ্রীয় সরকার তাহাকে শাস্তি না দিয়া কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া তাহাকে পুষিতেছেন। আফজল গুরুও একইভাবে জামাই আদরে কাল কাটাইতেছে। এ কারণেই মুম্বাইবাসী আজ প্রশ্ন তুলিয়াছে, আমাদের নিরাপত্তা দিবে কে?

জঙ্গি কার্যকলাপে পূর্বের মতো সাম্প্রতিক মুম্বাই বিস্ফোরণেও জড়িত হইয়া গেল কলকাতার নাম। আশঙ্কা করা হইয়াছে মুম্বাই বিস্ফোরণে কলকাতার বেনিয়াপুকুরের এক বাসিন্দা রহিয়াছে। যাহার নাম আবদুল্লা ওরফে নাটা। ২০০২ সালে আমেরিকান সেন্টারে হামলার সঙ্গে তাহার যোগ ছিল, যোগ ছিল ২০০১ সালে খাদিমকর্তা অপহরণের ঘটনায়। গত বছর কলিকাতার কয়েকজন শিল্পপতির কাছ হইতে তোলা আদায়ের জন্য অনবরত হুমকি দিবার ঘটনায় নাকি রাজ্য গোয়েন্দারা তাহাকে খুঁজিতে ছিল। কিন্তু আমাদের সেকুলার ভারতবর্ষে বদমায়েশ মুসলমান হইলে আর বদমায়েশ থাকে না, সে হইয়া ওঠে এক শুদ্ধ সংখ্যালঘু। তাই গোয়েন্দারা তাহাকে কারাগারে পুরিয়া বিব্রত করিতে চান না। সংখ্যালঘুদের ভোট ব্যাঙ্ক রহিয়াছে। তাই তাহাদের শয়তানির দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া তাহাদের ভোটাধিকারের দিকে নজর দেওয়াই বুদ্ধিমান ধর্মনিরপেক্ষের কাজ। বাবু দিগ্বিজয় সিংহ এজন্যই মুম্বাই বিস্ফোরণে আর এস এসের হাত দেখিতে পাইয়াছেন। অবশ্য তাঁহার এযাবৎ নানা মন্তব্যে দেশের মানুষ তাঁহাকে বিংশ শতাব্দীর ভাঁড় হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছে। ভাঁড়ামিতে যদিও রাহুল গান্ধীও কম পারদর্শী নয়। মুম্বাই বিস্ফোরণের পর তাঁহার মন্তব্যও বিস্ময়বোধক। মহারাষ্ট্রে জোট সরকারের নেতারা এখন পারস্পরিক দোষারোপ ও একে অন্যের উপর দোষ চাপাইতেই ব্যস্ত। আসলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জাতীয় নিরাপত্তা ও স্বার্থের চাইতে নিজস্ব ধান্দাবাজিই বেশি প্রাধান্য পায়। সেজন্য হিন্দুস্থান ধীরে ধীরে তালিবানিস্তানে পরিণত হইতে চলিলেও তাহারা কুম্ভকর্ণ হইয়া থাকে। কাশ্মীর সন্ত্রাসীদের স্বর্গরাজ্য হইয়াছে, অসমসহ পূর্বাঞ্চল সন্ত্রাসীদের কব্জায় পরিণত হওয়ার অপেক্ষায়, আর পশ্চিমবঙ্গ তো সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর। ইতিপূর্বে দেশে যতগুলি সন্ত্রাসমূলক অপরাধ হইয়াছে অপরাধী হয় পশ্চিমবঙ্গ হইতে সে রাজ্যে গিয়াছে নতুবা অপরাধ করিয়া অপরাধী পশ্চিমবঙ্গ দিয়া বাংলাদেশ বা অন্যদেশে পলায়ন করিয়াছে। বলা হইতেছে ২৬ জুলাই ভারত-পাক বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠক বানচাল করিতেই নাকি এই হামলা। কিন্তু ভারত কি কখনও এই বৈঠক হইতে ইতিবাচক কিছু পাইয়াছে? আসলে পাকিস্তানের উদ্দেশ্য হইতেছে বারবার হামলার মাধ্যমে এই দেশের অর্থনীতি, সুস্থিতিকে বিনষ্ট করা। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যালঘু ভোটের লোভে সন্ত্রাসী তোষণ দেশের মানুষকে বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সন্ত্রাসীদেরই উৎসাহ জোগাইতেছে। তাই আগামীদিনে মুম্বাইতে পুনরায় সন্ত্রাসী হামলা বা বিস্ফোরণ ঘটিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকিবে না।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

আমরা স্বদেশের কল্যাণের জন্য মাতৃভূমির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা অতঃপর দেশজাত দ্রব্য ছাড়া ক্রয় করিব না। এই কার্য করিতে যদি কোনও আর্থিক বা অন্য কোনও প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহাও আমরা করিতে প্রস্তুত হইব। আমরা এইরূপ কার্য কেবল নিজেরাই করিয়া ক্ষান্ত হইব না, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য লোকদিগকেও এইরূপ করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিব। ভগবান আমাদের এই শুভ সংকল্পে সহায় হউন।

— কৃষ্ণকুমার মিত্র, 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা

রমনের মতো জঙ্গলমহলে উন্নয়নের অস্ত্রই বেছে নিয়েছেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত আট বছরে ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলায় এবং রাজ্যের অন্যত্র যে উন্নয়নের কাজ চলছে তার শতকরা একভাগও পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছর সরকার চালিয়ে বামফ্রন্ট করতে পারেনি। এরাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী পারবেন কিনা তা ভবিষ্যৎই বলবে। গত ১০ জুলাই কলকাতায় ড. শ্যামাপ্রসাদ জন্মবার্ষিকীর এক অনুষ্ঠানে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রমন সিং এই মর্মে বক্তব্য রাখেন। সেইসঙ্গে মাওবাদী সমস্যার সমাধানে বহুমুখী কৌশলের দাওয়াইয়ের কথাও কলকাতায় এসে জানিয়ে গিয়েছেন এই মুহূর্তে দেশের সর্বাধিক মাওবাদী-অধ্যুষিত রাজ্য ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী রমণ সিং। তাঁর মতে, শুধু পুলিশ বা আধা-সামরিক বাহিনী নয়, মাওবাদী মোকাবিলায় উন্নয়নের অস্ত্রই বেশি কার্যকরী। এ রাজ্যে জঙ্গলমহলে ঠিক যে পথ নিয়েছেন নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বনবাসী তরুণদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে স্পেশাল পুলিশ অফিসার (এসপিও) হিসাবে নিয়োগ করে এবং 'সালওয়া জুডুম' তৈরি করে তারা মাওবাদীদের বলপূর্বক দমন করতে চেয়েছে এবং তাতে বিপদ আরও বেড়েছে বলে প্রভূত সমালোচনা আছে ছত্তিশগড়ের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের রায়ও 'সালওয়া জুডুম' এবং এসপিও-দের নিরস্ত্র করতে বলেছে। ছত্তিশগড় সরকার তার বিরুদ্ধে পর্যালোচনার আবেদনও করতে চলেছে সর্বোচ্চ আদালতে। সম্প্রতি জঙ্গলমহলে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, বন্দুক তুলে নিন, কিন্তু তা দেশের জন্য যা অনেকটা রমন সিং-এর 'সালওয়া জুডুম'-এর মতো। কিন্তু রমনের কথায়, ''নকশাল বা মাওবাদী হিংসার পরেও আমরা এগোচ্ছি। আমার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ কিন্তু শিশুমৃত্যু, প্রসূতি মৃত্যু,

ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট সভাগারে ভাষণরত রমণ সিং।

অপুষ্টির হার কমানো। মাওবাদী নয়! আমরা মনে করি, মাওবাদীদের সঙ্গে লড়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু এই ব্যাধিগুলো না-আটকালে পরবর্তী প্রজন্ম ক্ষমা করবে না।" মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে জঙ্গলমহলে প্রথম সফরে গিয়ে সেখানকার মানুষের জীবনের এই জাতীয় দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানের উপরেই বেশি জোর দিয়েছেন মমতাও।

পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছত্তিশগড়ের বিজেপি সরকারের প্রশাসনিক প্রধানের আরও একটি বিষয়ে মতের মিল আছে। মমতার মতো রমনও মাওবাদী সমস্যার সূত্রপাতের জন্য কমিউনিস্টদের দায়ী মনে করেন! রমনের বক্তব্য, ''নকশালবাড়ির আন্দোলনকে সাধারণ ভাবে নকশাল রাজনীতির গোড়াপত্তন ধরা হয়। কিন্তু তারও অনেক আগে তেলেঙ্গানায় কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিদ্রোহ, বিক্ষোভ হয়েছিল। তখনকার মতো ওই আন্দোলন দমন করা হলেও তার বীজ রয়ে গিয়েছিল।"

রমন আরও বলেছেন, অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে পি সি জোশী গণতান্ত্রিক পথে সংসদীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতা দখলের কথা বলেছিলেন। কিন্তু বি টি রণদিভের সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন তখন বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। বাম বা অতি-বাম আন্দোলনে হিংসার ব্যবহারের শিকড় সেখানেই নিহিত বলে ছত্তিশগড়ের চিকিৎসক মুখ্যমন্ত্রীর অভিমত।

রমণের দাবি, বনবাসী বা মাওবাদী-অধ্যুষিত দুই জেলা বস্তার ও সরগুজার মানুষকে জোর করে অস্ত্র ধরানো হয়নি। মাওবাদীদের হাতে মার খেয়ে তাঁরাই সরকারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। রমনের কথায়, ''বস্তারে গত ১০ বছরে ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত আমাদের হাতেই এসেছে। যেখানে ভোট দিলেই মাওবাদীদের বুলেটের ভয়, সেখানে এই ঘটনাই তো আমাদের সাফল্য!" তবে একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করছেন, অস্ত্র এবং বাহিনী দিয়ে মাওবাদীদের বশে আনা যথেষ্টই কঠিন। তাঁর বক্তব্য, ''এক বীরাপ্পনকে ধরতে তিনটি রাজ্যের সরকার ৪০ হাজার সেনা নামিয়েছিল। এখানে তো হাজারটা বীরাপ্পন! তা ছাড়া, ভারতের পুলিশ কখনওই গেরিলা যুদ্ধের জন্য মানসিক বা শারীরিক ভাবে প্রস্তুত নয়। এখন গেরিলা যুদ্ধের কৌশল শিখিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ 'গ্রে হাউন্ড' তৈরি করেছে। আমরাও স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গড়েছি। সরগুজার পরিস্থিতি অনেকটা ভাল। ৪০ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা-বিশিষ্ট বস্তারের মানুষও সাহায্য করছেন।" উল্লেখ্য, বস্তার জেলা কেরল প্রদেশের থেকেও বড়।

তাঁরা যে উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে হাত দিয়েছেন, তার কথাও সবিস্তার জানিয়ে গিয়েছেন ছত্তিশগড়ে দ্বিতীয় দফার মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের ৩৪ লক্ষ অন্ত্যোদয় পরিবারের জন্য ৩৫ কিলো চাল সস্তায় দেওয়ার জন্য সমবায় প্রথায় কিছু বিপণি খোলা হয়েছে, যাতে চাল চুরি আটকানো গিয়েছে। সমবায় বিপণিগুলিকে সরকার আর্থিক সাহায্য করছে এবং তার মাধ্যমেই সরকারের সঙ্গে বনবাসী জনতার যোগসূত্র নিবিড় করার চেষ্টা হচ্ছে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটানো হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলেও প্রসূতিদের জন্য অ্যাম্বুল্যান্স পাঠিয়ে প্রসব-প্রক্রিয়ার পুরো খরচ সরকার বহন করছে। তবে রমণ বলছেন, এই উন্নতির ধারা আরও বাড়াতে হবে। এ রাজ্যে ঠিক যে চেষ্টায় হাত দিয়েছেন মমতাও। ছত্তিশগড়ে যেমন সমবায় বিপণির মাধ্যমে সস্তায় চাল দেওয়া হচ্ছে, এ রাজ্যে জঙ্গলমহলে তেমনই থানাকে সেই কাজে লাগাতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা।

বস্তারে আকরিক লোহার খনি বহুজাতিকের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগকেও নস্যাৎ করছেন রমণ। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ''ওখানে ২৪ ঘণ্টাই বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। তফসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত পরিবারগুলির ৬ হাজার ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক। আমিই দেশের একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী, যিনি বলতে পারেন, আগামী ২০ বছর আমার রাজ্যে লোডশেডিং হবে না!"

অসমের বাজেট অধিবেশনে এবার বিশেষ আলোচ্য

‘কাঁটাতারের বেড়া ও জাতীয় নাগরিক সূচী’

সংবাদদাতা॥ অসমে দুটি কাজ সরকারিভাবে অনেকবার শেষ করার কথা ঘোষণা করা হলেও এযাবৎ তা শেষ হয়নি। আর তা হলো, জাতীয় নাগরিক সূচী বা ন্যাশন্যাল রেজিস্টার অফ্ সিটিজেন এবং অসমের আন্তর্জাতিক সীমান্তে, মূলত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ। বার বার দিনক্ষণ স্থির হয়, সরকার বা মন্ত্রীরা ঘোষণাও করে দেন অমুক তারিখের মধ্যে জাতীয় নাগরিক সূচী আপ-টু-ডেট করা হবে এবং অমুক তারিখের মধ্যে বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ হবে। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মতোই তা আর হয়ে ওঠে না। গত ১৪ জুলাই এই দুই বিষয়ে শাসকদল ও বিরোধী (অগপ ও বিজেপি) উভয়পক্ষই গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তখন বিধানসভার স্পীকার প্রণব গগৈ বিষয় দুটির গুরুত্ব বিবেচনা করে চলতি বাজেট অধিবেশনেই বিশেষ আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছেন।

এদিন রাজ্য বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে অগপ বিধায়ক পদ্ম হাজারিকা ওই দুটি বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর উত্তরেই অধ্যক্ষ মহোদয় এই প্রস্তাব দেন। অসম চুক্তি রূপায়ণ মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা জানিয়েছেন, ‘‘বেড়া দেওয়ার প্রথম দফার কাজ শেষ হয়েছে। রাস্তা তৈরিও প্রায় সম্পূর্ণ। ৪৭ কিলোমিটার এলাকায় নদীই সীমানাজ্ঞাপক। সেখানে বি এস এফ টহল দেয়। তবে জানা নেই বি এস এফ এর টহলদারি ঠিকঠাক হয় কিনা! আমরা ওই জলসীমান্তে বেশি নজর দিচ্ছি।’’

মন্ত্রীর মতে ‘‘জাতীয় নাগরিক সূচী (NRC) আপ-টু-ডেট হলে অসমে ঝুলে থাকা ‘ডি’-ভোটার সমস্যার অবসান হবে। ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল এবং অল অসম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন বা আসু ভূমিপুত্রদের বিষয়টি বারবার সামনে আনছে। অথচ এন আর সি-র ক্ষেত্রে ‘ডি’ ভোটররা বৈধ (Sacred)। আপার (Upper) অসমে ‘ডি’ ভোটার নিয়ে কোনও সমস্যাই নেই। কেননা সেখানে ‘ডি’ ভোটারই নেই। বরপেটার ঘটনায় সংখ্যালঘুরা মনে মনে ভয়ের আবহে রয়েছে। বাস্তব অবস্থা হলো, ‘ডি’ ভোটার সমস্যা, এন আর সি আপডেট এবং অসমীয়া ভূমিপুত্রদের নিশ্চিত নিরাপত্তা প্রদান— এগুলি একসঙ্গে হতে পারে না। কিন্তু ‘আসু’ (All Assam Student Union) সবগুলো বিষয় একসঙ্গে তুলছে। সরকারকে এন আর সি বিষয়ে একটু নরম হতে হবে কিছুটা হলেও আপস করতে হবে। বিষয়টা সবার জানা। কী সামাজিক কী রাজনৈতিক নেতা-কর্মী---সকলেই জানেন যে, ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর পর যারাই অসমে ঢুকেছেন তাদেরকে এন আর সি (জাতীয় নাগরিক তালিকা)-তে আপ-টু-ডেট করার সময় অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। সরকারকে এন আর সি আপ-টু-ডেট করার ক্ষেত্রে এটাই গাইড লাইন হিসেবে মেনে চলতে হবে। আসু’র মতো সংস্থার পক্ষে সরকারের কাজকর্মের ধরন-ধারণ নিয়ে কোনওরকম বিরক্ত করা উচিৎ হবে না। এভাবে ‘এন আর সি’ আপ-টু-ডেট করা যেতে পারে। আসু’কে বাস্তব অবস্থাটা বুঝতে হবে। আমরা পদ্ধতিগত বিষয় নয়, কাজটা শীঘ্র শেষ করতে চাই— ওদিকেই আমাদের লক্ষ্য রয়েছে। বিধানসভার একটি প্রতিনিধি দল শীঘ্রই রাজ্যের সীমান্ত পরিদর্শনে যাবেন’’।

সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী নীলমণি সেন ডেকা বলেছেন, ‘‘ওই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দিষ্ট আলোচনার জন্য স্পীকারকে আলাদা করে সময় দিতে হবে। যাতে করে ঐক্যমতে পৌঁছানো যায়।’’ তখন স্পীকার আলাদা করে সময় দেবেন বলে জানিয়ে দেন।

এখানে দুটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, গত ২০০৪-এর জানুয়ারি মাসের গোড়ায় অসম সফরে এসে অসমের কাছাড় জেলার সদর শহর শিলচর সার্কিট হাউসে স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় এন ডি এ-সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী স্বামী চিন্ময়ানন্দ। তিনি জানিয়েছিলেন ২০০৬-০৭-এর মধ্যে সীমান্তে বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ হবে। এখনও হবে হবে বলা হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, নির্বাচনের মুখে অসমের কংগ্রেসী সরকার ‘এন আর সি’ আপ-টু-ডেট করার কাজ বন্ধ করে দেয়। এমনকী নির্বাচন কমিশনের নির্দেশকে কলা দেখিয়ে ‘ডি’ ভোটারদের ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এখানে জানা দরকার যাদের নাগরিকত্ব বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়নি, মামলা চলছে আদালতে তাদেরকেই ‘ডি’ ভোটার বলা হয়। ভোটার তালিকায় তাদের নামের পাশে ‘ডি’ লেখা থাকে। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে তারা অবাধে ভোট দিয়েছে বলেই খবর।

ভারতকে এন এস জি-তে ঢুকতে দিতে চায় না চীন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিশ্বের অন্যান্য পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতও আজ একাসনে বসার শক্তি ধরে। ভারত বরাবরই জানিয়ে এসেছে যে ‘নন-প্রোলিফারেশন ট্রিটি’ (এন পি টি)-তে স্বাক্ষর করবে না। একথা স্বীকার করেও আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পরমাণুশক্তিধর রাষ্ট্রগুলি ভারতের নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার্স গ্রুপ (এন এস জি)-এর সদস্য হওয়ার দাবীকে সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু এতে গোঁসা হয়েছে চীনের। চীনের বক্তব্য, তাহলে পাকিস্তানকেও এই সদস্য পদ দেওয়া হোক। ৪৬ সদস্য বিশিষ্ট এন এস জি-র কাছে চীনের দাবী, সদস্য পদ দেওয়ার ব্যাপারে যোগ্যতাসম্পন্ন সব প্রার্থীদের বিষয়েই বিবেচনা করা হোক। ঘটনা হলো সব যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী বলতে ভারতের পর বাকি থাকে শুধু দুটি দেশ— পাকিস্তান ও ইজরায়েল। এই দুটি দেশও এন পি টি-তে স্বাক্ষর করেনি। অর্থাৎ ইসলামবাদকে মদত দেওয়াই হলো চীনের আসল উদ্দেশ্য। চীনের এই দাবী ভারতের এন এস জি সদস্য হওয়ার বিষয়টিকে জটিল করে তুলবে।

ঘটনা হলো, চীন কিন্তু এর আগে এন এস জি সদস্য পদের ব্যাপারে এন টি পি-তে সইয়ের বদলে মাপকাঠি-ভিত্তিক (ক্রাইটেরিয়া-বেসড) লক্ষণগুলির উপরই গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। সেদিক থেকে দেখলে অবশ্য ভারতের পক্ষে ইতিবাচক একটা দিক রয়ে গেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ভারত সফরকালে ভারত-মার্কিন যৌথ বিবৃতিতে এন এস জি-তে সদস্য হিসাবে ভারতের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিকে সমর্থন জানানো হয়েছিল। সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে নিজেদের পক্ষে আনার জন্য ভারত-আমেরিকা যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে চীনের আপত্তি কোথায় গিয়ে ঠেকে সেটাই এখন দেখার।

দিগ্বিজয়দের মতো ‘হিজ মাস্টারস্ ভয়েস’ মার্কা সারমেয়দের কথায় কান না দেওয়াই ভাল

সোনিয়া কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দিগ্বিজয় সিংহ সাম্প্রতিক মুম্বাই বিস্ফোরণে সঙ্ঘ পরিবারের ‘হাত’ দেখতে পেয়েছেন। যদিও এই ‘হাত’টি তাঁর দলেরই নির্বাচনী প্রতীক। তাঁর দলের মুসলিম তোষণের প্রতীক। তবে এইসঙ্গে একটি কথা জেনে রাখা ভাল। দিগ্বিজয় বা তাঁর দলের নেতারা আদতে সেই পুরানো গ্রামোফোন কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের ছবির বিশ্বস্ত সারমেয়। যে ছবির তলায় লেখা থাকে ‘হিজ মাস্টারস্ ভয়েস’। দিগ্বিজয় যা বলেছেন বা বলেন তা রাহুল গান্ধীর ‘ভয়েস্’। রাহুল বিতর্কের ভয়ে যে সব দেশবিরোধী কথা বলতে পারেন না, তা তিনি দিগ্বিজয়ের মতো পা চাটা মোসাহেবদের দিয়ে বলান। যেমন, মনমোহন সিংকে হঠিয়ে রাহুলের প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিটি দখলের প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু তিনি নিজে সে কথাটা বলতে চান না। তাই দিগ্বিজয়ের মতো নেতাদের দিয়ে কথাটা পাড়েন। তাই হিজ মাস্টারস্ ভয়েসের সারমেয়দের কথায় কান না দেওয়াই ভাল। ভারতের একটি শিশুও জানে যে গত প্রায় দুই দশকে মুম্বাইসহ সারা দেশে যে জঙ্গি হামলা হয়েছে তার প্রতিটির মূল শিকড় ছড়িয়ে পাকিস্তানের মাটিতে। ১৯৯৩-র ১২ মার্চ মুম্বাইতে প্রথম ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটে। দাউদ ইব্রাহিমের ডন কোম্পানী বাবরী ধ্বংসের প্রতিহিংসায় মুম্বাইয়ের ১৩টি স্থানে শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটায়। মৃত্যু হয় ২৫৭ জনের। আহত সহস্রাধিক। দাউদ এখন পাকিস্তানের করাচী শহরে নিজস্ব প্রাসাদে সপরিবারে বহাল তবিয়তে বাস করছে। সেখানে বসেই রিমোট কন্ট্রোলে ডি-কোম্পানীর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাচ্ছে। পাক সরকারের প্রত্যক্ষ মদত ছাড়া যে তা সম্ভব নয় সবাই জানে। তবু সন্ত্রাস বিরোধী আন্তর্জাতিক মহল সব জেনেও চুপ করে থাকে। পাকিস্তান ঠিক এইভাবেই ওসামা বিন লাদেনকে লুকিয়ে রেখেছিল। এরপরেও পাকিস্তানকে ‘সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র’ হিসাবে চিহ্নিত করায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের এতটা দ্বিধা কেন বোঝা দায়।

১৯৯৩-র প্রথম সন্ত্রাসবাদী হামলার পর মুম্বাইতে আরও ৮টি বড় ধরনের জেহাদি জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে। যেমন, ৬ ডিসেম্বর, ২০০২

গূঢ়পুরুষের

কলম

তারিখে ঘাটকোপার এলাকায় বাসে রাখা বোমা বিস্ফোরণে ২ জন মারা যান। ২৭ জানুয়ারি, ২০০৩, ভিলে পার্লেতে সাইকেলে রাখা বোমা বিস্ফোরণে ১ জন মারা যায়। ২০০৩ সালে মুম্বাইতে চারটি জঙ্গি হামলা হয়। ওই বছরেই ১৪ মার্চ মুলুন্দ এলাকায় ট্রেনে বিস্ফোরণে ১০ জন যাত্রী প্রাণ হারান। ২৮ জুলাই ঘাটকোপারে আবার বাসে রাখা বোমা বিস্ফোরণে ৪ জনের মৃত্যু হয়। ২৫ আগস্ট, জাভেরি বাজার এবং গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার কাছে দুটি পৃথক বিস্ফোরণে প্রাণ হারান ৫০ জন। এরপর প্রায় তিন বছর জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেনি। সাময়িক বিরতির পর ১১ জুলাই ২০০৬, মুম্বাইয়ের শহরতলির ট্রেনে ভয়াবহ ধারাবাহিক বিস্ফোরণে প্রাণ হারান ২০৯ জন নিরপরাধ মানুষ। হামলার দায় নেয় লস্করের ভারতীয় শাখা ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন। এরপরেই ঘটে পাকিস্তান থেকে সমুদ্র পথে আসা জঙ্গিদের হামলা। মুম্বাইয়ের তাজ হোটেল এবং সংলগ্ন এলাকায় ২৬ নভেম্বর, ২০০৮ প্রায় চারদিন টানা হামলায় কেঁপে ওঠে সারা দেশ। এই হামলায় মুম্বাই পুলিশের বিবৃতি অনুযায়ী মারা যান মোট ১৭২ জন। সর্বশেষ হামলার ঘটনাটি ঘটেছে চলতি বছরের ১৩ জুলাই। মুম্বাইয়ের তিনটি ব্যস্ততম এলাকায় সন্ধ্যায় শক্তিশালী বিস্ফোরণে সরকারি হিসাবে প্রাণ হারিয়েছেন ১৮ জন। দিগ্বিজয়ের মতো গান্ধী পরিবারের তল্পিবাহকরা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতেই পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি হামলায় সঙ্ঘ পরিবারের হাত দেখতে পায়।

মুম্বাইকে জঙ্গি হামলার নিশানা করার পিছনে প্রত্যক্ষ কারণ এই ব্যবসায়িক শহরটি ভারতের ‘অর্থনৈতিক রাজধানী’। ভারতের আর্থিক বনিয়াদকে ধ্বংস করতে গেলে মুম্বাইকে ধ্বংস করতে হবে এমনটাই ইসলামি জঙ্গিরা মনে করে। ইসলামে পশুহত্যার পদ্ধতিতে ‘হালাল’ কথাটা বলা হয়েছে। এর অর্থ, বধ্য পশুটির গলার নলি কেটে ধীরে ধীরে রক্তপাত ঘটিয়ে মৃত্যু ঘটানো। এই অতি নৃশংস পাশবিক পদ্ধতিই জঙ্গিরা মুম্বাইয়ে প্রয়োগ করছে। মুম্বাইয়ের বাণিজ্যিক এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ধীরে ধীরে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি করতে থাকলে একটা সময় ভারতের আর্থিক প্রগতি স্তব্ধ হবে। ভারত দুর্বল রাষ্ট্র হবে।

সম্প্রতি লাদেন পরবর্তী আল কায়দার সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ঘোষণা করেছে, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, ভারতই এক নম্বর টার্গেট।’ বলা হয়েছে, ‘হিন্দু ডমিনেটেড ইন্ডিয়া, অ্যান আনফিনিসড্ চ্যাপটার অফ ইসলামিক কঙ্কোয়েস্ট’। ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে অতীতে ইসলামের পদানত রাষ্ট্রের ১০০ শতাংশ মানুষকে ২০ বছরের মধ্যে ধর্মান্তরকরণ করা হয়েছে। একমাত্র ভারতেই ৮০০ বছর মুসলমান রাজত্বে তা’ সম্ভব হয়নি। তাই সেই অসম্পূর্ণ কাজটি আল কায়দা শেষ করতে চায়। হ্যাঁ, এরপরেও দিগ্বিজয়রা জঙ্গি হামলায় সঙ্ঘ পরিবারের ‘হাত’ দেখেন।

রাজ্যের বিজয়ী ও পরাজিতদের অবস্থান কোথায়?

নিশাকর সোম

বিগত কয়েকদিন ধরে মুম্বাই-এর বিস্ফোরণ এবং সেইসঙ্গে তিনটি রেল দুর্ঘটনা-দুর্ঘটনাবহুল একটি সপ্তাহ। দেশে জঙ্গিদের কার্যকলাপ যে ধারাবাহিক ভাবেই চলছে সেটা কেহই আর অস্বীকার করতে পারছেন না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র- মন্ত্রকের ব্যর্থতা প্রকট। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে মাওবাদী হাঙ্গামা বাড়ছে— কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাজ্য-সরকারের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে মূল দায়িত্ব রাজ্য-সরকারের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রক সারা দেশের জঙ্গিরোধের কোনও একটি সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা হাজির করেনি। অথচ এন ডি এ সরকারের আমলে কংগ্রেস এন ডি এ সরকারের স্বরাষ্ট্রনীতি নিয়ে অনেক সমালোচনা করেছে। রাহুল গান্ধী বক্তৃতায় বলেছেন ১০০ শতাংশ জঙ্গি-ঘটনা রোধ করা সম্ভব নয়। চমৎকার যুক্তি!

সন্ত্রাসের পাশাপাশি হয়েছে রেল দুর্ঘটনা। রেল দুর্ঘটনা সম্পর্কে বলা যায় বিগত আড়াই মাস-এ ৫৭টি ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছে। এইসব দুর্ঘটনা সম্পর্কে যে কথাগুলো উঠে এসেছে তা হলো— (১) ট্রেনের ইঞ্জিনগুলিকে বেশি দৌড় করানো হচ্ছে। (২) ট্রেনে অদক্ষ ড্রাইভারকে কাজে লাগানো হচ্ছে। (৩) সিগন্যাল-এর বিশৃঙ্খলা। (৪) ট্রেন-এর নতুন লাইন বসানো হচ্ছে। নতুন ট্রেন চলছে, বাড়ছে না রেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ট্রেন দুর্ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রীকে দুর্ঘটনাস্থলে যাবার অনুরোধ করেন। মুকুল রায় প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ মানেননি! এর কারণ মুকুল রায় জেনে ফেলেছিলেন যে তাঁকে রেলমন্ত্রী করা হচ্ছে না। কাজেই তিনি গোঁসা করে গেলেন না। নতুন রেলমন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদী কাজ শুরু করছেন—অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।

জঙ্গলমহল নিয়ে যে কর্মসূচী মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তা হলো— (১) জঙ্গলমহলের সব লোককে বিপিএল-এর অন্তর্ভুক্ত করা। এই অঞ্চলে দরকার খাদ্য-সরবরাহ ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষা, গণ-শিক্ষা তথা বয়স্কশিক্ষার ব্যবস্থা। জঙ্গলমহলের মানুষদের মমতা বলেছেন— সরকারের পক্ষে বন্দুক ধরতে— সশস্ত্রবাহিনীতে চাকরি নিন। প্রশ্ন হলো— এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে জঙ্গলমহলে কি বিভাজন সৃষ্টি হবে না?

এদিকে মহাশ্বেতাদেবী প্রমুখরা বিনা শর্তে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবি করেছেন। দাবি করেছেন কেন্দ্রীয়বাহিনী প্রত্যাহারের। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা— ''অস্ত্রহীন জঙ্গলমহলে কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রত্যাহার করা হবে।''

উল্লেখ করা প্রয়োজন, তৃণমূল-কংগ্রেস জোট সরকারের জঙ্গলমহল নীতি, মূল্যবৃদ্ধি নীতি, স্বাস্থ্যনীতি ও শিক্ষানীতির বিরোধিতা করেছে এস ইউ সি। তৃণমূলের কর্মীদের বক্তব্য, এস ইউ সি এ-রাজ্যে ক্রমশ লুপ্ত হবে। তৃণমূলকর্মীরা মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে বলছেন— ''বিগত বাম সরকার ২২ লক্ষ কোটি টাকার দেনা রেখে গেছে। এই দেনা শোধ করার জন্যই জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো হয়েছে।''

মুখ্যমন্ত্রী মহাকরণ থেকে সর্বস্তরের প্রশাসনকে শক থেরাপি দিচ্ছেন। সি এম ও অফিসে দিল্লী থেকে আনা গৌতম সান্যালকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তিনি আই এ এস এবং আই পি এস-দের উপর ছড়ি ঘোরাচ্ছেন। ফলে মহাকরণে মহা ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মহাকরণ থেকে সর্বস্তরের প্রশাসনকে শক থেরাপি দিচ্ছেন। সি এম ও অফিসে দিল্লী থেকে আনা গৌতম সান্যালকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তিনি আই এ এস এবং আই পি এস-দের উপর ছড়ি ঘোরাচ্ছেন। ফলে মহাকরণে মহা ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

যা দেখ্‌ছি, শুনছি তাই লিখছি। নতুন সরকারের ভাল কাজকে অবশ্যই সমর্থন জানাচ্ছি।

রাজ্যসভায় তৃণমূলের প্রার্থী নিয়ে দলের মধ্যে এমনকী সাংবাদিক- সংবাদপত্রের একাংশও বিস্মিত।

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, নিচের তলার মতামতকে গ্রহণ করে নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর্যালোচনা করতে হবে। আরও বক্তব্য হলো, রাজ্য-সিপিএম নেতৃত্ব বামফ্রন্ট সরকারকে ধনিক-বণিকদের পোষণ করে। গরীবদের কাছ থেকে পার্টি দূরে সরে গেছে। ফলে গরীবরাও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সিপিএম পরিচালিত কৃষক সংগঠনে পশ্চিমবঙ্গের কৃষক সংগঠনের নেতৃত্বকে 'ধনী কৃষকদের প্রতিভূ' বলেছেন। প্রসঙ্গত এ-রাজ্যের কৃষকসভার নেতৃত্ব বর্ধমান গোষ্ঠী কব্‌জা করে রেখেছে। প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক পি-সুন্দরাইয়া নিজের কিষাণ আন্দোলনের দলিলে হরেকৃষ্ণ কোঙারদের সমালোচনা করে বলেছিলেন, ''ধনী কৃষকদের ফিরিয়ে দিও না''। সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে সুস্পষ্ট নির্দেশ ক্ষেতমজুর সংগঠন এবং ক্ষেতমজুরদের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। গ্রামীণ রাজনৈতিক বিন্যাসে দেখা যাচ্ছে, এক সময়ে ধনী কৃষকদের মধ্যেই কংগ্রেসের দৃঢ়ভিত্তি ছিল। পরে সেটা সিপিএমের পক্ষে যায়। ফলে সিপিএম ধনী কৃষকদের স্বার্থ রক্ষাকারী হয়ে ওঠে। এই ধনী কৃষকরা এখন তৃণমূলের সংগঠনে এসে গেছে। এদিকে তৃণমূল গরীব ক্ষেতমজুরদের দাবির কথা বলেছিল। ফলে তৃণমূল দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করছে সিপিএম। বিভিন্ন কৃষিপ্রধান অঞ্চলে ক্ষেতমজুরদের মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইছে। যদিও এ-রাজ্যের সিপিএমের মাথা তুলে দাঁড়ানোর শক্তি এখনও ফেরেনি। সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রাক্কালে এই রাজ্যের নেতৃত্বের বিশেষ করে বুদ্ধ, বিমান,গৌতম-এর বক্তব্যকে সমালোচনা করে বলেছেন—এরফলে নির্বাচনী প্রচারে বামফ্রন্ট সরকারের ইতিবাচক দিক তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। এবারের ১৩ জুলাই প্রমোদ দাশগুপ্তের স্মারক বক্তৃতার বিষয় ছিল 'রবীন্দ্রনাথ'। বক্তা পরাজিত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বক্তৃতা প্রসঙ্গে বুদ্ধবাবু বলেছেন— পার্টির কিছু 'বামন' নেতা রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে পারেননি, ভুল সমালোচনা করেছিলেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, অবিভক্ত পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য ভবানী সেন—'রবীন্দ্র গুপ্ত' এই ছদ্মনামে 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের সমালোচনা' লেখায় রবীন্দ্রনাথের কালান্তর-এর বিভিন্ন কথা উদ্ধৃত করে লিখেছিলেন— 'রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া ভাবধারার কবি'। এই কথায় প্রথম প্রতিবাদ করেছিলেন অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়। পরবর্তীকালে পার্টি এই লেখাকে নিন্দা করেছিলেন। এক সময়ে অবিভক্ত পার্টির নেতা সোমনাথ লাহিড়ী বলেছিলেন—'আমাদের পার্টিতে গোপাল হালদার একমাত্র শিক্ষিত।' এই গোপাল হালদার পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে বিহারের বঙ্গভাষা কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ধিক্ কমিউনিস্টরা।

বিজেপি-র শরণাপন্ন

আর্থিক দুর্নীতি আর কর-ফাঁকি-তে জেরবার কেন্দ্রীয় সরকার মুখরক্ষায় অবশেষে শরণাপন্ন হলো প্রধান বিরোধী দল বিজেপি-র। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর প্রধান হিসেবে আপাতত গুডস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্সের বিষয়টিতেই মনোনিবেশ করবেন বিজেপি-র কেন্দ্রীয় কর্মসমিতির সদস্য ও বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল কুমার মোদী। মজার ব্যাপার, বিহারে গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-জে ডি ইউ জোটের অভূতপূর্ব সাফল্যের পর কংগ্রেসী সংবাদ মাধ্যমে সাফল্যের যাবতীয় কৃতিত্বটুকু পাচ্ছিলেন নীতিশ কুমার। উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সুশীল মোদী ছিলেন আগাগোড়াই ব্রাত্য। এখন আর্থিক অনিয়ম রুখতে কংগ্রেসী সরকার সেই সুশীল মোদীর শরণাপন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে ভোল পাল্টেছে কংগ্রেসী মিডিয়াও।

পদ্মনাভ-মন্দির কথা

প্রায় লক্ষ কোটি টাকার সম্পত্তির কারণে বহু আলোচিত তিরুবন্তপুরমের শ্রী পদ্মনাভ স্বামী মন্দিরে গত ১৭ জুলাই রাত্রে ঘটল আরও একটি মারাত্মক ঘটনা। পদ্মনাভ মন্দিরের সম্পত্তি সরকারী আদেশে আইনী প্রক্রিয়ায় আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে যাঁর বিরুদ্ধে অর্থাৎ অ্যাডভোকেট টি পি সুন্দেরারাজন হঠাৎ-ই মারা গেলেন ওইদিন। মন্দিরের পশ্চিমদিকের প্রবেশপথ থেকে মাত্র ৩০ মিটার দূরে নিজের বাসভবনে ৭০ বছরের ১৯৬৪ সালের ব্যাচের এই আই পি এস অফিসারটি আচমকাই ১৭ জুলাই মধ্যরাত্রে বুকে শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন ও তার কিছুক্ষণ পরেই মারা যান। যদিও ঘটনাটি স্থানীয় এলাকায় মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। মানুষ-জন বিশ্বাস করতে শুরু করেছে স্বর্গীয় প্রতিশোধেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। যাই হোক, ক্রমে অবস্থা যে দিকে এগোচ্ছে তাতে আগামীদিনে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি অবশ্যম্ভাবী। রাজ্য, কেন্দ্র উভয় সরকারই নির্বিকার।

উল্টো চাতকের মতো

বিশ্ব-উষ্ণায়নের কু-প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সারা দেশেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশ বেড়েছে জুন মাসে। তবে জুলাই মাস নাগাদ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমবে এবং পরিশেষে কিছুটা ঘাটতিই থেকে যাবে বলে আবহবিদদের অনুমান। গত মাসে সারাদেশে সামগ্রিকভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ১৮২ মিমি। সাধারণভাবে থাকার দরকার ছিল ১৬৩.৪ মিমি। তবে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে স্বাভাবিকের তুলনায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ২৭ মিমি কম। সেদিক দিয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রায় দ্বিগুণ বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে সাধারণের তুলনায়। এই মুহূর্তে খাদ্যদ্রব্যের মুদ্রাস্ফীতি ক্রমবর্ধমান। বৃষ্টিপাতের খতিয়ানের ওপর নির্ভর করে তথ্যাভিজ্ঞ মহল চলতি মাসের শেষেই খাদ্যদ্রব্যের মুদ্রাস্ফীতি কমার আশা করছেন। জনৈক ক্রেতার রসিকতা—"আমরা যারা বাজার করি তাদের অবস্থাটা উল্টো চাতকের মতো। বৃষ্টি কমার আশায় দিন গুনছি।"

শোক সংবাদ

সুকুমার পাত্র আর নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সুকুমার পাত্র আর নেই। সঙ্ঘের এই প্রবীণ প্রচারক গত ১৬ জুলাই, ২০১১, রাত্রি ১০টা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত এক সপ্তাহ ধরে কলকাতায় বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁর কিডনি কাজ করছিল না। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৬৫ বৎসর।

বাঁকুড়া জেলার মণ্ডলকুলী গ্রামে ১৯৪৭ সালের ১২ অক্টোবর তাঁর জন্ম। তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। তাঁর পুরো পরিবারই সঙ্ঘময়। শিক্ষাজীবন শেষ করে ১৯৭১ সালে স্বদেশ তথা হিন্দুসমাজের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক হিসাবে আত্মোৎসর্গ করেন। বীরভূম জেলার রামপুরহাটের মল্লারপুরে তাঁর প্রচারক জীবনের সূচনা। সঙ্ঘের মেদিনীপুর ও নদীয়া বিভাগ প্রচারকের দায়িত্ব সামলেছেন। পরে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গের প্রান্ত সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। মৃত্যুর আগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গে প্রান্ত কার্যকারিণী মণ্ডলের আমন্ত্রিত সদস্য ছিলেন।

তাঁর অনাড়ম্বর জীবন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। সরল জীবনযাপন ও উচ্চ চিন্তার প্রতীক ছিলেন তিনি। অসুস্থ হলে প্রাকৃতিক চিকিৎসার প্রতিই তাঁর বেশী ঝোঁক ছিল। জ্বর হলে কালো গরুর ঈষদুষ্ণ দুধ খেয়েই সুস্থ হয়ে উঠতেন। সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, স্বয়ংসেবক তথা তাদের পরিবারের সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। সবাই তাঁকে পরিবারের একজন বলেই মনে করতেন। বহু কৃষক পরিবার তাঁর পরামর্শে চাষবাস করতেন। নিজের প্রতি কঠোর এবং অন্যের প্রতি মমত্ব ছিল তাঁর জীবনবোধ। তাঁর প্রয়াণে শুধু সঙ্ঘপরিবার নয়, দেশও একজন নীরব দেশব্রতী সুসন্তানকে হারালো।

পরলোকে বিশাখা বিশ্বাস

গত ১০ জুলাই ভোর পাঁচটায় বোলপুরে পরলোকগমন করেছেন অধুনা প্রয়াত প্রেমোৎপল বিশ্বাসের সহধর্মিণী শ্রীমতী বিশাখা বিশ্বাস। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় সত্তর বছর। তিনি বেশ কিছুদিন কিডনীর অসুখে ভুগছিলেন। রেখে গেলেন পুত্র, পুত্রবধূ এবং নাতি-নাতনীদের। রয়ে গেছে নিজ বাড়ীতে তাঁর অঙ্কিত অনেক অমূল্য চিত্র। উল্লেখ্য, শ্রীবিশ্বাস তাঁর স্ত্রী বিশাখা বিশ্বাসের নামে স্বস্তিকা-য় গত কয়েক বছর ধরে লিখে এসেছিলেন।

* * *

রায়গঞ্জ মহকুমা সঙ্ঘচালক বিজয়কৃষ্ণ তালুকদার মহাশয়ের পিতৃদেব অজিত তালুকদার গত ৪ঠা জুলাই সোমবার ভোরে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বৎসর। তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র-পুত্রবধূ এক কন্যা-জামাতা, নাতি-নাতনি ও আত্মীয় পরিজনদের রেখে গেছেন।

* * *

গত ৫ জুলাই ভোরে পুরুলিয়া সদর খণ্ড বৌদ্ধিক প্রমুখ ত্রিনয়নীশঙ্কর ওঝার মাতৃদেবী পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬০ বৎসর। তিনি একপুত্র, কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

আর এস এসের মালদা জেলার গাজোল মহকুমার বৌদ্ধিক প্রমুখ আনন্দমোহন তরফদারের মাতৃদেবী গত ২৯ জুন মধ্যরাতে পরলোকগমন করেন। মৃতুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি পুত্র-পুত্রবধূ, কন্যা ও নাতি-নাতনীদের রেখে গেলেন।

সংশোধনী

স্বস্তিকা'র গত ১১ জুলাই সংখ্যার ২৬ নং পৃষ্ঠায় 'শ্রীগুরুপূর্ণিমা ও আর এস এস' শীর্ষক রচনায় একটি লাইনে 'শ্রীগুরুদক্ষিণা উৎসব'-এর স্থলে 'শ্রীগুরুপূজন উৎসব' পড়তে হবে।

কর্তৃত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠছে প্রধানমন্ত্রীর

তারক সাহা

অবশেষে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী। চারিদিকে সমালোচনার ঝড়ে বিধ্বস্ত আমাদের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং মুখ খুললেন। নাম তাঁর মনমোহন হলেও দেশের বেশীরভাগ মানুষের মন মোহন করতে পারেননি এযাবৎ। সীমাহীন দুর্নীতি এর আগে কখনও ঘটেনি। মাত্রাছাড়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, তাতে লাগাম পড়াবার কোনও প্রয়াস নেই। বিভিন্ন দপ্তরের ওপর ক্রমাগত কর্তৃত্ব শিথিল। এবং সেই কর্তৃত্ব এতটাই শিথিল যে একজন প্রতিমন্ত্রী তাঁর নির্দেশ সরাসরি অগ্রাহ্য করার সাহস করতে পারে। কৃষি উৎপাদন নেমে ১ শতাংশে পৌঁছেছে। চীন ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর বাঁধ নির্মাণ করছে, যার ফলে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল শুখা রাজ্যে পরিণত হতে চলেছে অচিরেই। তাতে কোনও প্রতিবাদ নেই বিদেশ দপ্তর থেকে। নিজের দলেরই সাধারণ সম্পাদক দিগ্বিজয় সিং তো তাঁকে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রীর তখতে ২০১২ সালে রাহুল গান্ধীকে বসাবার প্রস্তাব রেখেছেন রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক ডেকে। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে একজন সজ্জন ব্যক্তি সাজলেও তাঁর রিপোর্ট কার্ড-এর হাল খুব খারাপ এবং তিনি যে এক পুতুল প্রধানমন্ত্রী তা তার আচরণের মাধ্যমে বারেবারেই প্রচার করেছেন নিজেই।

গত ২৯ জুন দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সম্পাদকদের সামনে নিজেই বলেছেন, 'I am in charge'—অর্থাৎ তিনি ক্ষমতায় রয়েছেন দলের নেত্রীর দয়ায় এমন কথা এর আগে কোনও প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে শোনা যায়নি। সরকারের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব কতটা শিথিল সেই বিষয়টা এর মধ্য দিয়ে কি প্রকাশ পায় না? আবার তিনি বলেছেন যে, দল চাইলে তিনি নিজে সরে গিয়ে রাহুলের জন্য জমি ছেড়ে দেবেন। এমন কথা কি কোনও প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে আগে কেউ শুনেছে? অর্থাৎ তিনি নিজেই মেনে নিচ্ছেন যে, তিনি কারুর দয়ায়, বদান্যতায় দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদে রয়েছেন। তিনি ফের বলেছেন, সোনিয়াজীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সুমধুর। এমন একজন গো-বেচারা মানুষের কী কোনও শত্রু থাকতে পারে! সোনিয়াজী ভালভাবেই জানেন যে, তাঁর নিজের পুত্র যদি ২০১৪-তে (যার সম্ভাবনা প্রবল যদি কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতায় ফেরে) রাহুলও তাঁর অতটা বাধ্য হবেন না যতটা মনমোহন বাধ্য। কে এমন ভাল এক মৌনীবাবাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে চাইবে? সোনিয়া অতটা মূর্খ নন, তড়িঘড়ি এমন এক নিরীহ মানুষকে সরিয়ে এক পথের কাঁটাকে খুঁজে আনবেন। কাঁটা তো কাঁটাই তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক, তা বিঁধবেই শরীরে। সুতরাং মনমোহনের মতো এমন এক নির্বিবাদী মানুষ তাঁর দলে একটিও নেই। কাজেই তাঁর সঙ্গে যে সোনিয়াজীর সম্পর্ক ভাল হবে এ তো জানা কথাই। তা আর ঢাক পিটিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। অবশ্য এই বিবৃতি ম্যাডামকে তুষ্ট রাখার প্রক্রিয়ার সরলীকরণমাত্র।

সম্পাদকদের সামনে তিনি অকপট স্বীকার করেছেন যে তিনি একজন অর্থনীতিবিদ। অর্থশাস্ত্র তিনি গুলে খেয়েছেন। টেলিকমের বিষয়টা তিনি একদমই বোঝেন না। তাই এত বড় কেলেঙ্কারী ঘটে গিয়েছে। এ কথা সত্যি যে, একজন মানুষ সর্ববিদ্যাবিশারদ হতে পারেন না। তিনি অবশ্যই তাঁর ব্যতিক্রম নন। তবুও তো তাঁর সহকর্মীদের দোষ-ত্রুটির দায় তাঁকেই নিতে হবে, তাঁকে শুনতে হবে সমালোচনা, কারণ তিনি সবার শীর্ষে বসে আছেন। তাঁর অধীনেই গোয়েন্দা সংস্থা রয়েছে। গোয়েন্দারাও তাঁকে সময়মত সব অবগত কেন করায়নি তার দায় দেশের একজন কর্ণধার হয়ে তাঁকে তো নিতেই হবে। ১২১ কোটি আম-আদমির মধ্যে একজন-ই তো প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁর দক্ষতার নিরিখেই তো তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন। তিনি টেলিকমের বিষয়ে কিছুই জানি না বললেই কী তাঁর দায়িত্ব এড়াতে পারেন? আসলে আজকাল প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী থেকে আমলা নির্বাচিত হন দক্ষতার নিরিখে নয়, বরং দলের সর্বময় কর্তা/কত্রীর কতটা কাছের তারই মাপকাঠিতে মাপা হয় যোগ্যতা। সুতরাং এমনটা যে হবেই তা সুবিদিত।

এ-রাজার কেলেংকারী যখন জনসমক্ষে এলো তখন মনমোহন অকপটে স্বীকার করলেন জোটধর্ম পালন করতেই এমন দু'-একটা কালির দাগ গায়ে লাগতেই পারে। এমন স্বগতোক্তির তাৎপর্য কি? এমন বিবৃতি প্রমাণ করে না যে, এই

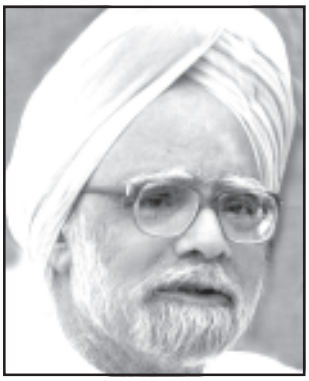

সোনিয়াজী ভালভাবেই জানেন যে, তাঁর নিজের পুত্র যদি ২০১৪-তে (যার সম্ভাবনা প্রবল যদি কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতায় ফেরে) রাহুলও তাঁর অতটা বাধ্য হবেন না যতটা মনমোহন বাধ্য। কে এমন ভাল এক মৌনীবাবাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে চাইবে? সোনিয়া অতটা মূর্খ নন, তড়িঘড়ি এমন এক নিরীহ মানুষকে সরিয়ে এক পথের কাঁটাকে খুঁজে আনবেন।

বিবৃতি তাঁর নয়, এই বিবৃতি যেন লিখে দেওয়া বিবৃতি, আগে থেকে কেউ লিখে দিয়েছে আর তিনি তাঁর পাঠকমাত্র। এমন একজন দুর্বল মানুষ ক্ষমতার শীর্ষে থাকা উচিত কি? মনমোহন যদি সৎ, সজ্জন ব্যক্তি হতেন, ক্ষমতার লোভ যদি তাঁর না থাকতো তবে তিনি নৈতিক দায় স্বীকার করে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিতেন। তাঁর এত কীসের লোভ? একজন অর্থনীতিবিদ, বড় বড় পদে চাকরি করেছেন, তাঁর প্রধানমন্ত্রী হবার শখও মিটিয়েছেন সোনিয়া। ইতিহাসে তাঁর নাম বাবর, আকবর, কার্জনদের পাশে লেখা থাকবে। আগামী দিনের পড়ুয়ারা, মায় তাঁর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা জানবে তাদেরই পরিবারের একজন দেশের কর্ণধার ছিলেন। সুতরাং তাঁর সরকারের সদস্যরা যখন বিভিন্ন আর্থিক কেলেংকারিতে জড়িত, তাঁর দলেরই সাধারণ সম্পাদক জনসমক্ষে তাঁর কর্মপদ্ধতি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছেন তখন তাঁর প্রধানমন্ত্রীর পদ আঁকড়ে পড়ে থাকার অর্থ হলো তাঁর চরিত্রের ওপরই কলঙ্ক লেপন।

সরকারের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব কতটা শিথিল তার প্রমাণ হলো গত কয়েকমাস ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রদবদল নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচনা হলেও তিনি বহুদিন যাবৎ তা করে উঠতে পারেননি। ইতিমধ্যে তেলেঙ্গানা নিয়ে ১৩ জন সাংসদ পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে বসে আছেন। আর এঁদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কেশব রাও যিনি ম্যাডামের একেবারে বিশ্বস্ত, যাঁকে ম্যাডাম ২০০৯ সালে এ রাজ্যে দূত করে পাঠিয়েছিলেন মমতার সঙ্গে লোকসভায় আসন রফার জন্য। এমন একটা সময়ে তেলেঙ্গানার সাংসদরা পদত্যাগ করলেন যখন ম্যাডামের কপালের ভাঁজ অনেকটা বেড়ে গেল। আসন্ন মন্ত্রিসভার রদবদল হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় তৈরি হলো।

কাজেই বিড়ম্বনা যেন কিছুতেই তাঁর পিছু হটতে চাইছে না। ইতিমধ্যে তাঁর সমস্যা ফের বাড়ালো সুপ্রিম কোর্ট। জুন মাসে বাবা রামদেবের অনশন কালোটাকার উদ্ধারের ব্যাপারে আর আন্না হাজারের নেতৃত্বে নাগরিক সমাজের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের সপক্ষেই সুপ্রীমকোর্টের গত ৪ জুলাইয়ের টিপ্পনি— কালো টাকা উদ্ধারের বিষয়ে সরকারের ঢিলেমিকে আদালত দুর্বলতা বলেই মনে করে। সরকারের কাজকর্মে একেবারেই সন্তুষ্ট নয় আদালত। তাই আদালত দুই প্রাক্তন বিচারপতিকে নিয়ে একটা বিশেষ তদন্তকারী দল বা সীট গড়ে দিয়েছেন। আদালতের এহেন পদক্ষেপ সরকার তথা প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানালো। অতীতে কোনও বিষয়ে এমন কড়া পদক্ষেপ করেনি সর্বোচ্চ আদালত। সুতরাং আদালতের এই সক্রিয়তা অবশ্যই সরকারের টিঁকে থাকার ওপর প্রশ্ন চিহ্ন তৈরি করলো।

এরপর উঠতে পারে আদালতের অতি সক্রিয়তার প্রশ্ন। আন্না হাজারের নেতৃত্বাধীন নাগরিক সমাজের কাজকর্ম নিয়ে ৩ জুলাই যে সর্বদলীয় বৈঠক হলো তাতে আশ্চর্যজনকভাবে সবদলই সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। এর মূল কারণ হলো সবদলেরই সাংসদদের মনে চিন্তা দানা বাঁধছে যে নাগরিক সমাজের আন্দোলন দানা বাধলে বা তারা যদি লোকপাল বিলের খসড়ায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় তবে তাদের সাংসদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে আর তাদের সংসদীয় ক্ষমতা অনেকটাই খর্ব হবে। কিন্তু এই নাগরিক সমাজ বা সাধারণ নাগরিকের ভোটেই তো সাংসদরা নির্বাচিত হন। কাজেই তাঁদের অপকর্মের, তাঁদের অসততার ওপর নজরদারি করাটাই তো নাগরিক সমাজের ইতিকর্তব্য। অসাধু সাংসদ বা বিধায়করা জনতার ভোটে নির্বাচিত, সুতরাং তাঁদের অপসারণের দায়িত্বও তো আমজনতার ওপর বর্তায়। লোকপাল বিলের মধ্যে এইসব ধারা সংযোজন প্রয়োজন যাতে কোনও অসাধু সাংসদ বা বিধায়ক তাঁর বা তাঁদের অপকর্মের জন্য দোষী সাব্যস্ত হলেই তাঁর বা তাঁদের সাংসদ পদ খারিজ করে ওই ব্যক্তির কেন্দ্রে পুনরায় নির্বাচন সংঘটিত করতে হবে। রাজনীতিতে স্বচ্ছতা আনতে, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন রুখতে এছাড়া আর উপায় কী? কিন্তু এসব নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নিরুত্তর। উল্টে তাঁর দল লোকপাল বিলে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর বা ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীকে এর আওতা থেকে বাইরে রাখার বিষয়ে তৎপর। এখানেই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সততা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এ রাজা, কানিমোজি বা সুরেশ কালমাদিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সরকারী বিলম্বে এই প্রশ্নগুলি সামনে আসছে। একটা মন্ত্রিসভার শীর্ষ-ব্যক্তি হিসেবে তাঁর ওপর তো দায়িত্ব বর্তায় এইসব অসাধু ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কালক্ষেপ না করে যথাশীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা নেওয়া। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী তা কিন্তু করেননি। হাইকম্যান্ড থেকে ইশারা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন তিনি। বিরোধীরা, নাগরিক সমাজ তৎপর না হলে এইসব অপরাধীরা চিরকালেই অন্তরালে থাকতেন। তাহলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী কী করে সজ্জন, সৎ, ভালমানুষ যাঁর অপরাধের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেবার একক শক্তি নেই, তাঁর কর্তৃত্ব নিয়ে সংশয় কি তৈরি হবে না আমজনতার মনে?

ভগবান পদ্মনাভনের সম্পদ তাঁর নিজেরই

ভগবান পদ্মনাভন যেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন, দেবী লক্ষ্মীও সেখানে স্থায়ীভাবে থাকেন। বিষ্ণু স্বয়ং ভগবানের অংশ। আবার সম্পদের দেবী লক্ষ্মী তাঁরই অংশ। তাই তিরুবন্তপুরমের পদ্মনাভ মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে এখন সম্পদ উদ্ধার হওয়া কোনও আশ্চর্যের বিষয় নয়। তিরুবন্তপুরম আগে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী ছিল।

এই বিশাল সম্পদের আবিষ্কারের পর একটা প্রশ্ন থেকেই যায় যে এই সম্পদ ভগবান পদ্মনাভন মন্দিরে এলো কি করে? বিশেষত যেখানে অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতিতে বালাজী মন্দিরের মতো কিংবা কেরলে গুরুবায়ু মন্দিরের মতো বড় মন্দির রয়েছে। এ দুটি মন্দিরে জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। বহু শতাব্দী ধরে বহু ভক্তের সমাগম হয়ে চলেছে এই মন্দিরে। এই দুই মন্দিরে মানুষের দানের পরিমাণ গত কয়েক শতাব্দী ধরে যে বৃদ্ধি হয়ে চলেছে তা নিয়েও কোনও প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন হলো— মন্দিরের এইসব সম্পদের কি হলো, গেল কোথায়? ভগবান পদ্মনাভন মন্দিরের ঐশ্বর্য আবিষ্কারের পর অনেক প্রশ্নই উঠে আসছে যা অসঙ্গত। এইসব অসঙ্গত প্রশ্নের উত্তরে একটা কথা বলা যেতে পারে এই বিশাল ঐশ্বর্য একমাত্র ভগবানের হাতেই সুরক্ষিত। এমনকী সরকার পরিচালিত ট্রাস্টের হাতেই এই ঐশ্বর্য সুরক্ষিত নয়। ত্রিবাঙ্কুরের রাজপরিবারসহ অন্য সব রাজপরিবার, দেশী-বিদেশী অনেক শাসক, ব্যবসায়ী এই বিপুল সম্পত্তি তথা অর্থদান করেছেন বলে এখন জানা যাচ্ছে।

একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে ভগবান পদ্মনাভন স্বয়ং ওই সম্পদ রক্ষা করে গেছেন রক্ষাকারী হিসেবে। ত্রিবাঙ্কুরের রাজপরিবারকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি। এও জানি যে তারা এখন আর্থিক কষ্টে কাল কাটাচ্ছে। মন্দির পরিচালনা করা আর্থিক দিক দিয়ে বেশ কষ্টসাধ্য। আর্থিক অনটন পুরোহিত, কর্মচারী ও রাজপরিবারের মধ্যে সমস্যা তৈরি করছে। রাজপরিবারের আর্থিক কষ্টের কথা নানাভাবে আমার কানে এসেছে। কিন্তু তারা কখনও মন্দিরের অর্থ স্পর্শ করতেন না। অথচ যা দিয়ে তারা তাদের অনেক প্রয়োজন মেটাতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি। মন্দিরে পরিচালনায় তাদের ভুলত্রুটি থাকতে পারে যা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। এই সম্পদ রক্ষার জন্য ত্রিবাঙ্কুরের রাজপরিবার সর্বদাই ছিলেন দায়বদ্ধ ও কর্তব্য বোধে আবদ্ধ। বৃটিশরা অনেক মন্দির লুঠপাট করেছে। এবং এই অর্থ লন্ডনের রাজপ্রসাদকে সমৃদ্ধ করেছে। মন্দির থেকে এই অর্থ আবিষ্কৃত হওয়ার পর রাণী হয়তো বৃটিশ অফিসারদের অপদার্থতার জন্য আক্ষেপ করে থাকবেন। বৃটিশ পরবর্তী গত ছয়দশক ধরে রাজনৈতিক নেতৃত্ব বৃটিশদের ফেলে যাওয়া কাজকে অর্থাৎ মন্দিরের সম্পদ পাচার করে যাচ্ছে। তিরুপতি ও গুরুবায়ুর এবং অন্যান্য আরও মন্দিরের অর্থ সম্পদ ঘরোয়া লুঠের বিশেষ নজির। হিন্দু মন্দিরের অর্থসম্পদ লুঠের ক্ষেত্রে ঘোরী ও গজনীকেও হার মানিয়েছে এইসব রাজনিতিকেরা। ত্রিবাঙ্কুরের শাসক এ থিরুমল মার্তণ্ড বর্মা ১৭৫০ সালের ১৭ জানুয়ারী মন্দিরে দাঁড়িয়ে ভগবান পদ্মনাভনের পায়ে সমস্ত রাজ্যকে সমর্পণ করেন। পরবর্তী শাসকেরাও নিজেদের ভগবান পদ্মনাভনের পায়ে সমর্পণ করেন নিজেদের পদ্মনাভ দাস বলে ঘোষণা করেন। তাঁরা পদ্মনাভনের অনুগত হয়ে শুধু রাজ্য ও মন্দিরেরই রক্ষা করেননি, সেইসঙ্গে মন্দিরে গচ্ছিত বিপুল সম্পদও রক্ষা করে এসেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর হিন্দু মন্দিরের জায়গা ও সম্পত্তি লুটের এক পরম্পরা চলতে থাকে। হয় রাজ্যের রাজনৈতিক নেতারা নয়তো স্থানীয় সমাজ-বিরোধীরা মন্দিরের জায়গা সম্পত্তি দখল করে নিচ্ছে, মিউজিয়ামে রক্ষিত স্বর্ণনির্মিত অলঙ্কার ও সামগ্রী শিল্পকলা ও প্রাচীন পুরাতাত্ত্বিক নির্দশনগুলি ভারতের বাইরে প্রদর্শনীর নামে বিদেশে চালান হয়ে গেছে। সেইসব প্রত্নসামগ্রী আর স্বস্থানে কোথাও ফিরে আসেনি। কোথাও বা ডুপ্লিকেট ফিরে এসেছে। মূল সামগ্রীটি চালান হয়ে গেছে বিদেশের বাজারে। এই ধরনের লুটের গুরুতর অভিযোগ কিছু রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে রয়েছে যারা এই লুটের টাকায় কোটিপতি হয়েছেন।

মন্দিরের সম্পদের হিসাব সন্ধানে কেউ না কেউ আদালতে গেছেন, আর তার ফলেই গর্ভগৃহের তালা খুলে গেলো। সুতরাং একথা বলতে দ্বিধা নেই যে কেউ না কেউ লুটের ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র রচনা

অতিথি কলম

রামমাধব

করে চলেছে। আমাদের দেশে বিশ্বাসঘাতক হিন্দুর অভাব নেই, অসৎ রাজনৈতিক নেতাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মন্দিরগুলো লুটের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজনৈতিক সংস্থাগুলি যে হিন্দু মন্দিরগুলোকে দখল করতে চাইছে আদালতের এই মামলাতে সে কথা স্পষ্ট হয়েছে। মন্দির বা মন্দিরের মালিকানাধীন সম্পত্তি— তা সে জমি দান ও পুরাতাত্ত্বিক সম্পত্তি যাই হোক না কেন, তা সবই হিন্দু সমাজের এবং তার মালিকানাও হিন্দু সমাজের। হিন্দু Endowment Act পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান এই আইনের সাহায্যে হিন্দু মন্দিরের সম্পত্তি সরকারি হয়ে যায়। তাই এই আইনের এমনভাবে পরিবর্তন হওয়া উচিত যার মাধ্যমে মন্দির সবকিছুই হবে হিন্দু সমাজের। ত্রিবাঙ্কুরের ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় হিন্দু সমাজ লোভী রাজনৈতিক নেতাদের চেয়েও মন্দিরের সম্পত্তিকে বেশি সুরক্ষা দিতে পারে এবং তার সম্পদ রক্ষা করতে সমর্থ।

কেরলের মুখ্যমন্ত্রী সতর্কতার সঙ্গে বলেছেন যে তার সরকার পদ্মনাভন মন্দিরের ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ বা মন্দিরের সম্পদের রক্ষা অধিগ্রহণে আগ্রহী নয়। সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশ মিউজিয়াম বা ট্রাস্ট তৈরি করার কথা বলেছেন যা সমর্থনযোগ্য নয়।

এখন যা প্রয়োজন তা হলো— সমগ্র হিন্দুসমাজ এবং তার আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও সন্ন্যাসীরা একত্রে গর্জে উঠুক এবং বলুক—মন্দির ও মন্দিরের সম্পদ অধিগ্রহণ করা চলবে না। হিন্দু সমাজই পূর্বের মতো রক্ষা করে চলবে নিজের সম্পদ ও হিন্দু মন্দিরের ব্যবস্থাপনাও থাকবে তার হাতে। হিন্দু সমাজের হাতেই হিন্দু মন্দিরগুলির পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হওয়া উচিত বলে মনে করি।

ব্রহ্মপুত্র নদের জল লুঠে চীনের চক্রান্ত

অশোকানন্দ সিংহল

ইয়াঙ্গতেজ নদীতে ২২,৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তিনটি অশ্বক্ষুরাকৃতি জলাধার।

প্রথমে এই প্রসঙ্গে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য জানানো দরকার বলে মনে করি। তথ্যগুলি হলো—

১. ভারতের সঙ্গে চীনের ২৫৬০ কিলোমিটারের লম্বা সীমারেখা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে জম্মু-কাশ্মীরে ১০৫০ কিমি (পাক-অধিকৃত কাশ্মীর সহ), হিমাচল প্রদেশে ১৭০ কিমি, উত্তরাখণ্ডে ৩০০ কিমি, সিকিমে ১৭০ কিমি এবং অরুণাচলপ্রদেশে ৮৭০ কিমি।

২. চীনের দুটি প্রদেশ, জিনজিয়াং এবং তিব্বত (জিজ্যাং) ভারতীয় সীমানা ছুঁয়েছে।

৩. তিব্বত উপত্যকা বিশ্বের মধ্যে জলের সর্ববৃহৎ উৎস বলে পরিগণিত। কারণ কয়েকটি বিশিষ্ট নদ-নদী যেমন সিন্ধু, সুতলেজ, ব্রহ্মপুত্র, অরুণা, নুজিয়াং, মেকং (ল্যাংক্যাং), ইয়াঙ্গতেজ ইত্যাদি নদীর উৎপত্তি এখান থেকেই।

ভারত ঘুরে সিন্ধু এবং সুতলেজ পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে এবং অরুণাচল প্রদেশের মধ্য দিয়ে অসমে এসেছে ব্রহ্মপুত্র। যেখানে নেপাল হয়ে অরুণা নদী কোশী নামে ভারতে প্রবেশ করেছে।

৪. চীনের ইয়ুনান প্রদেশের মধ্য দিয়ে মায়ানমারে প্রবেশ করেছে নুজিয়াং ঝর্ণা; ভিয়েতনাম, লাওস এবং তাইল্যান্ডে প্রবাহিত রয়েছে মেকং ঝর্ণা; যেখানে ইয়াঙ্গতেজ প্রবাহিত হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারত বরাবর, প্রশান্ত মহাসাগরে মিলিত হতে।

২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করে ইয়াঙ্গতেজ নদীতে ২২,৫০০ মেগাওয়াট ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন 'তিনটি অশ্বক্ষুরাকৃতি জলাধার' তৈরি করেছে চীন। বিশ্বের এই বৃহত্তম হাইড্রো-পাওয়ার প্লান্টটি সম্পূর্ণ হয়েছে ১২ বছরে (১৯৯৮-২০১০), যেখানে ২০০৮-এ ১৪ বছর পর সূচনা হলো ১৮,২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বাণিজ্যিক বংশপরম্পরার। এর পাশপাশি একইভাবে মেকং নদীর ওপর বহু জলাধার এবং পাওয়ার প্রজেক্ট চালু করেছে চীন।

এই প্রকল্পগুলোর জন্যই এশীয় দেশগুলোর বিভিন্ন জায়গায় খরা, বন্যা, ভূ-নিম্নস্থ জলস্তর নেমে যাওয়া ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে। থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং লাওস মিলে তৈরি হয়েছিল মেকং ওয়াটারস কমিশন, চীন ও মায়নমারের হাত থেকে বিষয়টি গ্রহণ করবার জন্য।

৫. ব্রহ্মপুত্র, চীনে যার নাম ইয়ারলুং জাংগবো, তিব্বতে সাংপো; তিব্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে এবং ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ঘেঁষে ১৭৪০ কিমি দীর্ঘ জায়গা জুড়ে প্রবাহিত হয়ে এটি 'গ্রেট বেন্ড'-এ পৌঁছে ইউ টার্ন নিয়েছে এবং অরুণাচল প্রদেশের গজরিং গ্রামে পৌঁছনোর মাধ্যমে ভারতে প্রবেশ করেছে দীর্ঘ ৬০ কিমি পথ পাড়ি দেবার পর।

৬. কেন্দ্রীয় সরকার সাংসদে স্বীকার করে নিয়েছে যে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর জাংমু-তে ৫১০ মেগাওয়াটের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তুলছে চীন। ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণ তাঁর সাম্প্রতিকতম চীন ভ্রমণের পর সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছেন, তাঁর চীনা প্রতিপক্ষরা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছে 'জলাধারে জল সঞ্চয়ের কোনও ব্যাপার থাকবে না এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে জলের নিম্নগতি প্রবাহের ক্ষেত্রে কোনও প্রভাব ফেলবে না।'

গ্রেট বেন্ড-এ চারটি সুড়ঙ্গ :

৪২ মিলিয়ন কিউবিক মিটার এবং ৩১ মিলিয়ন কিউবিক মিটার জলধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন দু'টি রিজার্ভার (পুকুর) ইতিমধ্যেই গ্রেট বেন্ড-এ তৈরি করে ফেলেছে চীন। তার দাবী করছে ভুমি-ক্ষয়ের ফলেই এই দু'টি রিজার্ভার তৈরি হয়েছে। কিন্তু প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয় নয়, ওই রিজার্ভার দু'টি মনুষ্য-সৃষ্ট। বর্তমানে চীন চারটি সুড়ঙ্গ নির্মাণ করছে। এর মধ্যে সুড়ঙ্গ-১ নং ১৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম, যেখানে অন্য দুটি সুড়ঙ্গ একত্রে ২৬০০ মেগাওয়াট (১৩০০ মেগাওয়াট করে) এবং চতুর্থ সুড়ঙ্গটি ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে। সুরঙ্গ-১ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রায় তৈরি।

এখানে চীন সরকার একটি পাঁচতারা হোটেল নির্মাণ করছে। এর নিরাপত্তার জন্য গ্রেট বেন্ড থেকে ১৬ কিমি দূরে নিঙ্গচিতে একটি সেনা-ছাউনিও তৈরি করেছিল তারা। চীনের

সেনাবাহিনীর দ্রুত যাতায়াতের জন্য পাঁচটি কমিউনিকেশন টাওয়ার, একটি ছোট জল-বিদ্যুৎ প্লান্ট এবং দু'টি সেতু নির্মিত হয়েছিল ব্রহ্মপুত্র হ্রদের ওপর। ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধক পদ্ধতি এবং ক্ষেপণাস্ত্র ইউনিটও চালু হয়েছিল এখানে। গ্রেট বেন্ড-এ রাস্তা এবং রেল যোগাযোগের পথ সুগম করতে কাজ চলছে অত্যন্ত নিপুণভাবে। এই এলাকায় কোনও জনবসতি নেই। বোঝাই যাচ্ছে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে সহায়তা করাই এই রাস্তা নির্মাণের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই স্থানের ১৬০ কিমি দূরে অবস্থিত নুজিয়াং নদী এবং চীনের বিমানবাহিনীর একটা ঘাঁটি রয়েছে কোয়ামজেয়ে।

হয় ভারত-সরকার অসতর্ক রয়েছে, নয়তো গ্রেট বেন্ড-এর অদূরেই চীনের ১১টি জল-সঞ্চয় প্রকল্প, ২টি খাল ও ৫টি জলাধার এবং জলনিকাশী কেন্দ্র গড়ে তোলার সত্যকে চাপা দিতে চাইছে। বাস্তবিক তারা জলের চরকার মতো মডেল (ভারতে একে বলা হয় রিহ্যাট) তৈরি করছে।

বাস্তবিকই চীন জল নিষ্কাশন পদ্ধতির মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্র সুড়ঙ্গ নং-৬ ও ৭ থেকে জল আনছে এবং বিভিন্ন উপায়ে এই জলপ্রবাহকে তার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করে দিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে দু'টি স্বয়ংশাসিত অঞ্চল— জিনজিয়াং ও নিনজসিয়া এবং তিনটি প্রদেশ কুইনঘাই, গানসু এবং শানসী। চীনের এহেন প্রকল্প দু'টি উদ্দেশ্যে— প্রথমত, জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এবং দ্বিতীয়ত, চীনের সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী মূল উদ্দেশ্যটা হলো ওইসব নদ-নদীর জলপ্রবাহের গতিপথ পাল্টে তার অনুর্বর উত্তরাংশের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। ব্রহ্মপুত্র নদের

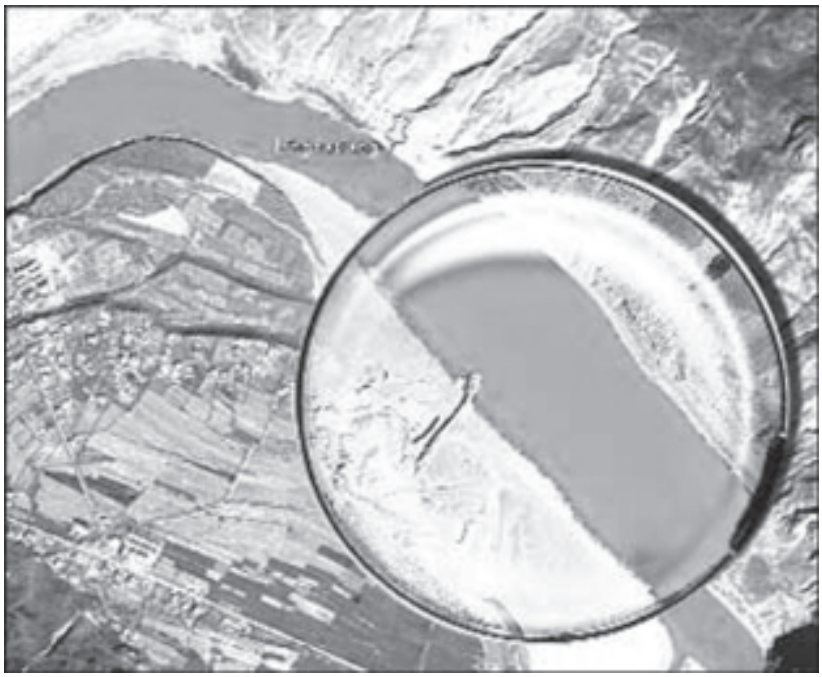

স্যাটেলাইট চিত্রে ব্রহ্মপুত্র নদের ছবি। চীনের জল লুঠের চিত্র ধরা পড়েছে।

জলের গতিপথ পরিবর্তন প্রকল্পটি আসলে দক্ষিণ থেকে উত্তরে গতিপথ পরিবর্তন পদ্ধতির অন্তর্গত। এটা ২০১৫ সালে সমাপ্ত হবে। কাজের গতি দেখে এই অনুমানটুকু করাই চলে। এই কাজটা ২০০৮ সাল থেকে হচ্ছে কিন্তু ভারত-সরকার এখনও নীরব।

চীন শুধুমাত্র ব্রহ্মপুত্র নদের জল আটকানোরই চেষ্টা করছে না, সিন্ধু এবং সুতলেজ নদের জল আটকানোরও পরিকল্পনার করছে। এই নদীগুলোতেও তারা রিজার্ভার এবং বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে।

বর্ষার সময়ে ভারতে ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহে জলের পরিমাণ থাকে ২৬৫৭ টিএমসি এবং বাকি ঋতুতে ১৯৮১ টিএমসি। কিন্তু বর্তমানে মরসুমের বাকি ঋতুতে তার জলপ্রবাহের ৬০ শতাংশ এবং বর্ষায় মাত্র ৭০ শতাংশ পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদ। যখন তিব্বতে সমস্ত জলাধার এবং জল- সঞ্চয় প্রকল্পগুলি একযোগে কাজ করবে তখন কি হবে? বর্ষা বাদে মরসুমের বাকি ঋতুতে আমরা মাত্র ২০ শতাংশ জল পাব। এখন বুঝতে পারছেন, কোন পথে আমরা চলেছি?

চীনের ওপর চাই সদা-সতর্ক নজরদারি

তারক সাহা

বিদেশ মন্ত্রকের আধিকারিকদের ঘোষণায় বিদেশমন্ত্রী এস এস কৃষ্ণের যে বয়ান সামনে এসেছে তাতে কয়েকটি বিষয় আমাদের নজরে এসেছে। সেগুলি হলো :

● ব্রহ্মপুত্রে যথেষ্ট জল রয়েছে যা দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশ এই দুই দেশের-ই চাহিদা পূরণ হবে।

● যদিও ভারত-চীনের মধ্যে জল বণ্টনের কোনও চুক্তি নেই তবুও দুই দেশের আধিকারিক পর্যায়ে যে আলোচনা হয় তাতে এই বিষয়টা যথেষ্ট গুরুত্ব পায়।

● জুন থেকে অক্টোবর এই কালখণ্ডে দিনে দু'বার সেইসব নদ-নদীগুলির জল প্রবাহ নিয়ে তথ্য আদান-প্রদান হয় যেগুলি দুই দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত, যেমন—ব্রহ্মপুত্র, শতদ্রু এবং সিন্ধু।

● ব্রহ্মপুত্রের অধিকাংশ উৎসমুখ ভারতীয় অঞ্চলে।

● চীন ভালভাবেই জানে ইয়ারলুং জাংপো-তে (তিব্বত) যদি ব্রহ্মপুত্রের জলের গতিপথের পরিবর্তন ঘটে তবে ভারত তার তীব্র প্রতিবাদ করবে।

বিদেশমন্ত্রী কৃষ্ণের মতে অসম ও অরুণাচল—এই দুই রাজ্যে ব্রহ্মপুত্র জলের সদ্ব্যবহার খুব জরুরী। তাঁর বয়ানে মনে হয় চীনের দিক থেকে ব্রহ্মপুত্র নিয়ে আশঙ্কার তেমন কিছু নেই। ব্রহ্মপুত্র ও তার শাখা নদীগুলি ৪০ হাজার মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ আমাদের দিতে সক্ষম। কিন্তু এই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে গেলে ভূ-কম্পনপ্রবণ এলাকাতে অতি বৃহদায়তন বাঁধ নির্মাণ দরকার। বিশ্বের বিশেষজ্ঞদের মতে ওই বাঁধ নির্মাণে যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে।

কৃষ্ণের ধারণা যে, জলের গতির বির্বতিত পথ নিয়ে উদ্বেগের বিশেষ কারণ নেই। কৃষ্ণের এই ধারণার উৎস অবশ্যই চীনের দেওয়া ১৪ জুনের বিবৃতি। এতে বলা হয়েছে যে, চীনের মাথায় রয়েছে ব্রহ্মপুত্রের নিম্নগতিপথে যেসব দেশ রয়েছে তাদের স্বার্থ রক্ষা করা। সুতরাং সেই দেশ এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেবে না যাতে এই যোজনার ফলে ওইসব দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। চীন বলছে ইয়ারলুং জ্যাংপো যোজনাটি আর্থিক যোজনা, রাজনৈতিক নয়। বর্তমানে এই যোজনাটি প্রচণ্ড ব্যয়সাপেক্ষ বলে এখনই তা হাতে নিচ্ছে না চীন। ব্যয় ছাড়াও বিশ্বজনমত এর বিরুদ্ধে, কারণ বহুশত বছর ধরে এই পবিত্র নদের ব্যবহার ভারত-বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ করছে। সুতরাং এদের বঞ্চিত করে চীন এই জল অন্যত্র সরিয়ে নেবে না।

যদিও চীন বলছে অদূর ভবিষ্যতে এদের এমন পরিকল্পনা নেই। তবুও অভিজ্ঞতা বলছে, চীনকে বিশ্বাস নেই। কয়েক দশক বাদে এই পরিকল্পনা যে চীন ফের চালু করবে না তার গ্যারান্টি কোথায়? চীনা কূটনীতির বৈশিষ্ট্য হল ভণ্ডামি আর দীর্ঘকাল চুপচাপ থাকা। ইয়ারলুং জ্যাংপো প্রকল্প যদি একবার চালু হয়ে যায় তবে জলপথের বিবর্তনের ফলে ভারতের অরুণাচল-অসম অঞ্চল এবং বাংলাদেশের মানুষ কীভাবে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে জলের স্বল্পতার কারণে তা কি ভাবা হচ্ছে? এই প্রশ্ন তুলেছেন জে এন শর্মা এবং ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত ভূ-তত্ত্ব বিদ্যার অধ্যাপক ও গবেষক কে ডি মালব্য যিনি ব্রহ্মপুত্র এবং অসমে বহমান বিভিন্ন নদ-নদীর ওপর ব্যাপক কাজ করেছেন। তিনি বলেছেন, ইয়ারলুং জ্যাংপো নদীর (তিব্বতীয় নাম) প্রকল্পটি তিব্বতীয় গতিপথে যদি শিগেটজস (Shigatze) করা হয় তবে গৌহাটিতে ১২ শতাংশ জল কম আসবে পাণ্ডু অঞ্চল থেকে। যদি সমগ্র জ্যাংপো প্রকল্পটি ঘুরিয়ে দেয় চীন তবে ১৬২৫ কিমি গতিপথে ৩০ শতাংশ জল কম ছাড়বে।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ব্রহ্মপুত্রের শাখানদীগুলি যে জল যোগায় তা তিব্বত থেকে প্রবাহিত জলের থেকে বেশি। বিষয়টা স্পষ্ট হলে অসম-অরুণাচলের নাগরিকরা আর ধোয়াশার মধ্যে থাকবেন না। তবুও আমাদের উপগ্রহের মাধ্যমে চীনের গতিবিধির ওপর বিশেষ নজরদারি রাখতে হবে। চীনের যা করে তার বেশিরভাগ অংশই অনুচ্চারিত। আমরা ১৯৬২ সালের ঘটনা ভুলতে পারি না। চীন সেই সময়ে বলেছিল যে, তারা ভারত আক্রমণ করবে না, তবুও তারা তা করেছিল। অতি সতর্কতার সঙ্গে দৈনিক পর্যায়ে নজরদারি রাখতে হবে এবং প্রয়োজনমত নিয়মিত কূটনৈতিক দৌত্য বজায় রাখতে হবে যাতে চীন তার ইয়ারলুং জ্যাংপো প্রকল্প নিয়ে যে কথা দিয়েছে তা থেকে যেন বিচ্যুত না হয়।

সুবিশাল ব্রহ্মপুত্র

প্রতিবেদক।। ব্রহ্মপুত্র নদ হিমালয় পর্বতমালার একেবারে উত্তরের কৈলাস রেঞ্জ (পর্বত)-এর দক্ষিণ 'কঙ্গি টিসু' হ্রদ থেকে বের হয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের তিব্বতী নাম হলো 'সাংপো' (Tsangpo)। সাংপো নদী দক্ষিণ তিব্বত থেকে পূর্বমুখী হয়ে ১৭০০ কিলোমিটার বয়ে গিয়েছে। এটা হিমালয়ের প্রায় সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হয়েছে। বিশাল এই যাত্রাপথে অনেক নদী, উপনদী, ঝর্ণা এসে ব্রহ্মপুত্র নদে মিলিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র ভারতে প্রবেশ করেছে অরুণাচল প্রদেশে দক্ষিণমুখী হয়ে। এখানে নাম 'ডিহাং'। অসমের সাদিয়া শহরে ডিহাং দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী। দু'টি পাহাড়ী ঝর্ণা লুহিত ও ডিহাংও ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হয়েছে। ১৫০০ কিমি এই সম্মিলিত ধারাই ১৫০০ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এখানে ব্রহ্মপুত্র শব্দের অর্থ ব্রহ্মার পুত্র। পুরাণে ব্রহ্মা-কে সৃষ্টিকর্তা বলে বন্দনা করা হয়েছে। এই নদী সেই স্রষ্টার পুত্র বলে ব্রহ্মপুত্র নামে খ্যাত।

এরপর ব্রহ্মপুত্র অসম উপত্যকায় পূর্ব-পশ্চিম জুড়ে ৭২০ কিমি যাত্রাপথে অনেক দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। অসমে গ্রীষ্মকালেও নদীটির বিস্তার অনেকস্থানে দশ কিলোমিটার। এই ব্রহ্মপুত্র বক্ষেই পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ 'মাজুলি'। আয়তন প্রায় ১২৫০ বর্গকিলোমিটার। অসম উপত্যকা জুড়ে নদীর গতিপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০০ কিলোমিটার। হিমালয় পর্বতমালা থেকে উদ্ভূত অনেক পাহাড়ী খরস্রোতা ঝর্ণা ব্রহ্মপুত্র নদে মিলিত হয়েছে। এই ঝর্ণাগুলির মধ্যে— সুবনসিরি, কানেং, ধনসিরি, মানস, চম্পামাটি, সরলভাঙ্গা এবং সঙ্কোশ। দক্ষিণতীরে প্রধান প্রধান উপদনী হলো— নোয়া ডিহিং, বুড়ি ডিহিং, দিসাং, দিখু এবং কপিলি। উত্তরঙ্গেও ব্রহ্মপুত্রের কয়েকটি শাখানদী রয়েছে। এগুলি হলো— তিস্তা, জলঢাকা, তোর্ষা, কালজানি এবং রায়ডাক। পাহাড়ে বিস্তার কম হলেও সমতলে পড়ার পরই নদীর বিস্তার বৃদ্ধি পেয়েছে। গারো পর্বতের পশ্চিমে বইতে বইতে ব্রহ্মপুত্র গোয়ালপাড়ার কাছে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। দক্ষিণমুখী হয়ে আরও ২৭০ কিমি প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। শাখানদী তিস্তাও গোয়ালন্দ পর্যন্ত যমুনা নামে প্রবাহিত।

তিব্বতে জমা বরফ মার্চ মাস থেকে গরম আবহাওয়ার কারণে গলতে শুরু করে। পরে তা ভারতীয় অববাহিকা অঞ্চলে নেমে আসে। দক্ষিণ-পশ্চিমী মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত-এর পরিমাণ বাড়ে, প্রায় ২৫০ সেমি। আরও নীচে বাংলাদেশে অববাহিক অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে ২৪০ সেন্টিমিটার।

(সূত্র : ওয়াটার রিসোর্স সিস্টেম প্ল্যানিং, ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সস, ব্যাঙ্গালোর, পৃ: ৮০)

'ব্রহ্মপুত্র' নিয়ে এত অনীহা কেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে অসমের জন্য আরও বড় দুঃখজনক ঘটনা অপেক্ষা করছে। কেননা চীন তিব্বত থেকে ভারতের অসমে ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবেশের অনেক আগেই এক বিরাট বাঁধের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে। কারও কারও মতে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। সংবাদমাধ্যমে এই খবরটা চাউর হতেই অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ হন্তদন্ত হয়ে দিল্লী গেছিলেন। খবরটা দিয়ে এলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণাকে। তারপর একরকম সন্তুষ্ট হয়েই অসমে ফিরে এলেন। এস এম কৃষ্ণার সঙ্গে তাঁর ঠিক কী কথা হয়েছিল তা অবশ্য আমাদের জানা নেই। বলতে গেলে

অসমে ব্রহ্মপুত্র

ব্রহ্মপুত্র নিয়ে অসম সরকারের পদক্ষেপ এটুকুই। তারপর তো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের চীনে যাতায়াত দহরম-মহরম-এর খবর সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। তবে চীনের ৬২ সালের ব্যবহারটা কেন্দ্র সরকারের মন্ত্রীদের মনে থাকলেই ভালো— পণ্ডিতজীর 'হিন্দী-চীনী ভাই ভাই' স্লোগানের পরিণতিটা।

সরকারের জানাই নেই ব্রহ্মপুত্র দিয়ে সারা বছরে কত পরিমাণ জল অসমের বুকে বয়ে যায়। এছাড়া অন্যান্য অনেক খুঁটিনাটি তথ্যের তো কথা ওঠে না। এজন্য অসম সরকারকে সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন ব্রহ্মপুত্র বোর্ড-এর দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। অন্য অনেকেই উপগ্রহ মারফত প্রাপ্ত ছবিও বাজারে বিক্রি করে থাকেন। চীন ব্রহ্মপুত্রকে নিয়ে যা করছে, যা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তা বাস্তবায়িত হলে ক্ষতির পরিমাণ কতটা কী হোত তাও জানা নেই কিছুমাত্র।

চীন ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথ বদল করলে যা ক্ষতি হবে তা এখনও বোধগম্য হয়নি। ব্রহ্মপুত্রের গতিপথের তাবৎ তথ্য নিজ থেকে সমীক্ষা করতে রাজ্য সরকারের হাত-পা কি কেউ বেঁধে রেখেছে? ফিবছর বন্যা ও নদীভাঙনে বিপর্যস্ত ব্রহ্মপুত্রের অসমের বিস্তীর্ণ এলাকা। তাহলে ব্রহ্মপুত্র নদ নিয়ে সমীক্ষা এতদিনেও করা হয়নি কেন— এই প্রশ্ন উঠছে স্বাভাবিক ভাবেই। দীর্ঘকাল এ ব্যাপারে ভাবনাচিন্তাই বা হয়নি কেন? বর্তমানে রাজ্যের জলসংসাধন মন্ত্রী রাজীবলোচন পেগু নিজেই মাজুলী (ব্রহ্মপুত্র নদীতে অবস্থিত দ্বীপ)-র বিধায়ক। তিনি এব্যাপারে আদৌ কোনও পদক্ষেপ নেবেন কিনা সেটা দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন অসমবাসীরা।

শেকড়ের সংস্কার

অন্য রকম

নিক্কি হ্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নাম তাঁর নিক্কি হ্যালি। পূর্ব-পুরুষের শেকড়ে সেভাবে কখনও আসা হয়নি। আপাদমস্তক আমেরিকান হলেও সাতপুরুষের ভিটে ভারতবর্ষকে তিনি ভুলতে পারেননি। সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের কোথায় যে তাঁর শিকড় সেটাই ভালভাবে জানেন না তিনি। তবু তিনি ভারতীয়। ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকাবাসী। বয়স ৩৯। আর এই বয়সেই মার্কিন গভর্নর হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। থাকেন কলম্বিয়ায়। স্বামী অবশ্য আমেরিকান, নাম মাইকেল হ্যালি। এক মেয়ে, এক ছেলে। মেয়ের নাম রেখেছেন রীণা, বয়স ১৩ বছর, আর ছেলের নাম নলিন, বয়স ৯। আমেরিকানের নাম— রীণা কিংবা নলিন শুনেছেন কখনও? জিন্দেগীতে আমেরিকানদের মধ্যে রীণা কিংবা নলিন নামে কাউকে খুঁজে পাবেন না, এরকম নাম একমাত্র ভারতীয়দেরই হয়। নিক্কি হ্যালির দেশপ্রেম (মানে ভারতপ্রেম) নিয়ে আর কোনও সন্দেহ আছে কি?

এবার তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু কর্মকুলতার দিকে চোখ ফেরানো যাক। আগেই জানানো হয়েছে তিনি কলম্বিয়ার শাসক মানে গভর্নর। কিন্তু আর্থিক মন্দা আমেরিকার অন্যান্য প্রদেশগুলোর মতো কলম্বিয়াতেও থাবা বসিয়েছিল ভয়ংকর ভাবে। কিন্তু গভর্নর হয়েই যে কঠিনতম কাজগুলো তিনি করেছেন, তা হলো বাজেট কাঁটছাঁট করা, কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধি করা এবং শিক্ষা, অর্থনীতি এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দিকে সর্বাগ্রে নজর দিয়ে ওগুলোর পরিকাঠামোকে খোলনলচে বদলে ফেলা এবং সংস্কারমুখী কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া। আর এটা করতেই হাল ফিরেছে স্টেটের। এবং সেই জৌলুস এতটাই যে পুরো ইউনাইটেড স্টেটস-এর বাহবা কুড়িয়ে নিয়েছেন তিনি।

বারাক ওবামা-র অভ্যন্তরীণ নীতির একজন কঠোর সমালোচকও তিনি। কখনও কখনও সেই সমালোচনার মাত্রা এতটাই বেশি হয়ে যায় যে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে তার জন্য জবাবদিহিও করতে হয়। চুপি চুপি জানিয়ে রাখা যাক, বারাক সাহেব নিক্কির দাপটে এতটাই তটস্থ যে শোনা যাচ্ছে রিপাবলিকান পার্টির টিকিটে আগামী বছর অর্থাৎ ২০১২-য় ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনি। যদিও এ ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহ দেখাচ্ছেন না নিক্কি স্বয়ং।

আপাতত তিনি অনেক বেশি মনোযোগী শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সব ব্যাপারে দক্ষিণ ক্যারোলিনা রাষ্ট্রটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। নজর দিয়েছেন বিশ্বের তাবড় তাবড় শিক্ষাবিদের বিদ্যাশিক্ষার পীঠস্থান ইউনিভার্সিটি অব্ সাউথ ক্যারোলিনায়। তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবশালী 'ডোনার' (অনুদানকারী) ডারলা মোরকে সরিয়ে দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বরং মোর-কে কাজে লাগিয়েছেন ক্যাম্পেন কনট্রিবিউটার হিসেবে। এইভাবে প্রশাসনের সর্বত্র স্তরে একটা পরিবর্তনের জোয়ার এনেছেন তিনি। এর জন্য কখনও কখনও কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে প্রবল সমালোচনাও হজম করতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে দিনের শেষে তিনিই সফল।

পেঙ্গুইন গ্রুপ গত জানুয়ারিতে আমেরিকার নতুন মুখ যে ২৯ জন গভর্নরের তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে সাফল্যের নিরিখে এক নম্বর জায়গাটা করতলগত করেছেন এই ভারতীয় শিকড়ের উচ্চশিক্ষিতা মেয়েটি। তবে মাটির কাছেই থাকতে চান তিনি। জাতীয় নিউজ চ্যানেলগুলোতে তাঁর কর্মসূচী প্রচারিত হওয়ার পাশাপাশি, ইউ-টিউব ইত্যাদি আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যেও মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন তিনি। মানুষকে নিয়েই এগিয়ে যাওয়া, ভারতীয় সনাতন চিন্তাধারা রক্তে না থাকলে এই জিনিসটা হয় না।

হিন্দুত্বকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয় কোনও চিন্তাশীল ভারতীয়ের পক্ষেই

ডাঃ গুরুপদ শান্ডিল্য ॥ গুজরাটের ভারতীয় বিচার মঞ্চের পরিচালনায় গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে এক দুদিন ব্যাপী আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যার বিষয় ছিল ''বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুত্ব।'' এই বইটি সেই আলোচনাচক্রে পঠিত কুড়িটি গবেষণাপত্রের সংকলন। গবেষণাপত্র রচয়িতাদের মধ্যে বহু বিশিষ্ট সারস্বত মানুষ আছেন, আবার সঙ্ঘ পরিবারের কর্মীও আছেন। নানা পশ্চাদভূমির বিদগ্ধ মানুষের মতামতের বিচিত্র এবং সমৃদ্ধ সমাহার এই সংকলনের মধ্যে মিলবে। বক্তৃতাগুলিতে একটা অভিন্ন মূল সুর নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু বৈচিত্র্যও নিতান্ত কম নয়। গ্রন্থ শুরু হয়েছে স্বামী সত্যমিত্রানন্দ গিরির আশীর্বাণী দিয়ে। আর শেষ হয়েছে মাননীয় সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবতের ভাষণ দিয়ে।

হিন্দুত্ব কি, তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। বক্তারা অনেকেই তার বিশেষ লক্ষণগুলি নিজের নিজের মতো করে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পাকাপাকি কোনও সংজ্ঞা তার থেকে উঠে আসেনি। মাননীয় সরসঙ্ঘচালক বলেই ফেলেছেন ''There is no need to define Hindutra is any manner.'' আবার হিন্দু কথাটিরও অর্থ স্পষ্ট করে বলা কঠিন, যদিও স্বামী বিবেকানন্দ থেকে বীর সাভারকর পর্যন্ত অনেকেই সে চেষ্টা করেছেন। এই পুস্তকের প্রবন্ধকারদের মধ্যে অনেকেই সে চেষ্টা করেছেন। মতের কিছু পার্থক্য থাকলেও সে চেষ্টা করেছেন। মতের কিছু পার্থক্য থাকতেই পারে এবং আছেও। বইটির অধিকাংশ বক্তা বীর সাভারকরের সংজ্ঞা অনুসরণ করেছেন। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে যাঁরা ভারতকে পুণ্যভূমি মনে করেন তাঁরাই হিন্দু। কিন্তু যাঁদের পুণ্যতীর্থগুলি ভারতবর্ষের বাইরে, পশ্চিম এশিয়ায়, তাঁরা হিন্দু নন। এই সংজ্ঞাই সাধারণ মানুষের বোধের কাছাকাছি বলে মনে হয়।

হিন্দু কথাটি বেদ-উপনিষদপ্রমুখ কোনও প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অধিকাংশ বিদ্বজনের ধারণা, ও নামটি বিদেশীদের দেওয়া। এককালে বর্হিভারতে 'হিন্দু' কথাটি সেই অর্থে ব্যবহার করা হোত, যে অর্থে এখন 'ভারতীয়' এবং 'ইন্ডিয়ান' শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কালে শব্দের প্রবাহিত অর্থের পরিবর্তন ঘটে। 'হিন্দু' কথাটির অর্থেরও অনুরূপ পরিবর্তন হচ্ছে। বহির্ভারতে খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ

শতাব্দীতে সর্বপ্রথম স্কাইলাক্স এবং খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীর সন্ধিকালে হিকাটাইয়স তাঁদের রচনায় 'ইন্ডিয়া' (India) শব্দটি ব্যবহার করেন। হেরোডোটস (খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী) দারাউস (৫২২-৪৮৬ খৃস্টপূর্ব) অধিকৃত ভারতের (সিন্ধু বা সিন্দ-এর সামান্য অংশ) বোঝাতে 'ইন্ডিয়া' শব্দটি প্রয়োগ করেন। নখস্-ই-রুস্তম লেখে এই শব্দটি উল্লিখিত। ভারতের উত্তরের প্রতিবেশীরাও ভারতীয়দের 'সিন-তু' বলে উল্লেখ করে থাকত।

সাহিত্যিক সলমন রুশদি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের ইতিহাস বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ভারতের ইতিহাস অযোধ্যার বা বাংলার বা মহারাষ্ট্রের পৃথক পৃথক ইতিহাস। আধুনিক কালে এই সমস্ত রাষ্ট্রসমূহ একত্রিত হয়ে 'India nation'-এ পরিণত হচ্ছে। এধরনের মতাবলম্বী আরও অনেকে। এরা যদি ভারতবর্ষকে বা তাঁর ইতিহাসকে একটু গভীরভাবে চেনার চেষ্টা করতেন, তাহলে দেখতে পেতেন আবহমানকাল থেকে ভারতের হিন্দুরা আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত অসংখ্য পুণ্যতীর্থে তীর্থযাত্রা করে আসছেন। এই তীর্থযাত্রা কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, আসাম থেকে গুজরাট গোটা ভারতের মানুষকে এক পবিত্র ধর্মের বন্ধনে বেঁধে রেখেছে যুগযুগান্ত ধরে। হিন্দুদের যে কোনও অবশ্য কর্তব্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সমস্ত ভারতের তীর্থসমূহকে, সমস্ত ভারতের পুণ্যসলিলা নদীকে স্মরণ করা হয়ে থাকে। যেসব সাধুসন্তের পরিব্রাজন অবশ্য করণীয়, ভারতের সমস্ত তীর্থদর্শন করা তাঁদের আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ। স্মরণাতীত কাল থেকে ভাষার পার্থক্য, পোষাকের পার্থক্য, সামাজিক রীতিনীতির তফাৎ কোনটাই সাধারণ মানুষের তীর্থযাত্রার অন্তরায় হয়ে উঠতে পারেনি। এই তীর্থযাত্রার উৎস হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুত্ব। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যে সব মেকলে পুত্র বা বিদেশী রাজনৈতিক দর্শনের ভক্তরা এসব তথ্য উপেক্ষা করেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ''তাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। সকল খেতের আবাদ এক নহে, ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে সেই প্রাজ্ঞ।''

ভারতবর্ষের বিশাল বৈচিত্র্য এবং বহুত্বের মধ্যে একত্ব কিন্তু অনেক বিদেশী ঐতিহাসিকের চোখে ধরা পড়েছিল। যদিও ঔপনিবেশিক যুগে ভারতকে পরাধীন রেখে লুণ্ঠনের তাগিদে তাঁরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এদেশের ইতিহাস রচনা করেছেন, তথাপি অনেকের চোখেই ভারতীয় সভ্যতার মৌলিক চরিত্রটি উদ্ঘাটিত হয়েছে। ভিনসেন্ট আর্থার স্মিথ তাঁর 'দি অক্সফোর্ড হিস্টরি অব্ ইন্ডিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন : The most essentially fundamental unity rest upon the fact that the diverse people of India had developed a peculiar type of culture or civilisation ulterly different from any other type in the world. The civilisation may be summed up in the term Hinduism" (PX) অর্থাৎ ভারতবর্ষ তার যুগযুগান্তের সাধনায় যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে তার সমতুল সভ্যতা বা সংস্কৃতি বিশ্বের অন্য কোথায়ও নেই। এক কথায় এই সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে হিন্দুধর্ম বা হিন্দুত্ব বলা যেতে পারে।

'হিন্দুত্ব' কথাটির কোনও ধরাবাঁধা সংজ্ঞা না পাওয়া গেলেও আমরা সকলেই ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝি। কারণ অধুনা হিন্দুত্ব একটি প্রবল সাংস্কৃতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। এই আন্দোলনের কোনও কোনওদিক কারও কারও কাছে অপ্রিয় হতে পারে। এদের ডঃ প্রবীণ টোগারিয়া মহাশয় 'সিউডো -সেকুলার,' 'সিউডো-

হিন্দু', 'হিন্দু-বিট্রেয়ার' ইত্যাদি নিন্দাসূচক নামে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু প্রিয় বা 'অপ্রিয়' যাই হোক, কোনও চিন্তাশীল ভারতীয়ের পক্ষেই হিন্দুত্বকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে যদি কেউ হিন্দুত্বকে না দেখার ভান করেন, আধুনিক ভারতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হবে না।

এইখানেই বইটির সার্থকতা। বিভিন্ন চিন্তাশীল মানুষ হিন্দুত্বের ধারণা ও কর্মসূচীকে নানাদিক থেকে পরীক্ষা করেছেন। অভিনিবেশ নিয়ে তাঁদের বক্তব্য পড়লে আমাদের এ বিষয়ে ধারণায় কিছুটা স্বচ্ছতা আসবে।

ভারতের জনসংখ্যার সিংহভাগ হিন্দু। তাই কেউ পছন্দ করুক বা না করুক, হিন্দুচেতনা ভারতীয় চেতনার একটা বড় অংশ জুড়ে আছে এবং থাকবে। সব দেশেই তাই ঘটে। পাশাপাশি অন্য ধর্মস্রোত থাকবে এবং আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করবে। কিন্তু হিন্দুধারাই প্রধানধারা এবং ভবিষ্যতেও প্রধান ধারা হয়েই থাকবে।

এই মূলধারা এবং তার বিভিন্ন উপস্রোত আমাদের ভালভাবে চিনে নেওয়া দরকার। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন মনীষী— যেমন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, রামমোহন রায়, বিবেকানন্দ, গান্ধীজী, সাভারকর, রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে নিজেদের ধারণা সবিস্তারে ব্যক্ত করেছেন। বিভিন্ন বক্তা এঁদের মতামত উদ্ধৃত করেছেন। বইটি ইংরেজীতে লেখা। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাও হিন্দিতে বইটির অনুবাদ করা আশু প্রয়োজন। তাহলে বিষয়টি আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে।

বইটি ছাপা এবং বাঁধাই চমৎকার। উদ্যোক্তরা একটি মহৎকর্ম সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন।

বইটির নাম : **Hindutva at Present**

(ইংরাজি বইয়ের বঙ্গানুবাদের পর্যালোচনা)

সম্পাদনা : দত্তত্রেয় হোসবালে

'মন্টুবাবুদের' জন্য নয়

ভিক্ষুদেব ভট্ট

'ইসলামীস্থানের পথে হিন্দুস্থান' বইটি পড়তে পড়তে বার বার মনে পড়ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'পুরাতন ভৃত্য'-এর কেষ্টার গুণের একটি কথা—'যত পায় বেত, না পায় বেতন/তবু না চেতন মানে'। শত সহস্র অত্যাচারের বেত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে খেয়েও হিন্দুদের চেতনা ফেরা দায়। উক্ত বইটিতে অজস্র ঘটনা ঠাসাঠাসি করে স্থান পেয়েছে অথচ লেখন- ভঙ্গীতে পাঠ সাবলীল গতিতে এগিয়ে চলে। পঞ্চম পরিচ্ছদে শুরু—'ডোডো পাখি বেশ কয়েক শো বছর আগে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত। ডোডো পাখির মতো পৃথিবী থেকে হিন্দুর বিলুপ্তিও অবশ্যম্ভাবী। ডোডো একটি পর্তুগীজ শব্দ। এর অর্থ বোকা।...' ৩০-৩৫ কেজি ওজনের পাখিগুলিকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে স্পেন ও পর্তুগালের নাবিকেরা মেরে খেত, সঙ্গেও নিয়ে যেত। 'এতেও ডোডোগুলোর কোনও শিক্ষা হলো না।... শত্রু চিনল না, শত্রু দেখলে পালাতে হয় বা পাল্টা আক্রমণ করতে হয় আত্মরক্ষার জন্য, সেটা শিখল না।... ভারতের হিন্দুরাও অনেকটা ডোডো পাখির মতো।'

হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে আমাদের বৃহত্তর ভারতের রাজনীতিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক বিভিন্ন জনের বক্তব্যও উপস্থিত। ঘটনা ও উদ্ধৃতির উল্লেখ দেখে সুস্পষ্ট যে, দীর্ঘদিন বহু পত্র-পত্রিকা এবং পুস্তক থেকে তথ্য আহরণ করে ধনী হয়েছে তাঁর সংকলন। দু'-একটা উদাহরণ দিই। 'প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত একবার বলেছিলেন, 'এপারেও বাঙালী, ওপারেও বাঙালী। যাওয়া-আসা চলেই থাকে। এ আবার অনুপ্রবেশ কি? আমি অনুভব করি না যে, বাংলাদেশীরা বিদেশী।' অনুভব না করার ফল লেখক সারা বইটিতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। '১৯৮০ সালে লন্ডনে ইসলামিক কালচারাল সেন্টার (আই সি সি) সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ২০০০ সালেই ভারতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে হবে' অনুপ্রবেশ, গণধর্মান্তর আর অসম্ভব জন্মহার বৃদ্ধির দ্বারা। North India by infillratiion and South India by mass conversion.'

৭৫/৭৬ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে বইটির প্রকাশ সেপ্টেম্বর, ২০১০। তাতে ভবিষ্যদ্বাণী— মমতার মুখ্যমন্ত্রী হওয়া। (পৃ-১১) '...এত করেও মিঞা সাহেবদের মন পাওয়া যাচ্ছে না। তাই তারা বামফ্রন্ট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এবার আসরে নেমে পড়েছেন 'দিদি'। মাদ্রাসা শিক্ষা তো অতি তুচ্ছ ব্যাপার। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য তিনি জান লড়িয়ে দিচ্ছেন। সিঙ্গুর ধর্নামঞ্চে মুসলিম কায়দায় মাথা ঢেকে নমাজ আদায় করলেন, সাঙ্গোপাঙ্গদের মাথায় টুপী পরিয়ে ইফতার পার্টিতে হাজির করলেন। রেলে চাকরীর ৩০ শতাংশ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের ঘোষণা করলেন। এতে সৈয়দ মহম্মদ নুরুর বরকতি রহমান সাহেব 'বহোৎ খুশ' হয়েছেন। আশা করা অসঙ্গত নয় এবার দিদিই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হবেন।...'

মাদ্রাসা শিক্ষা, হজযাত্রা, মসজিদে লাউড স্পীকার, মসজিদ-মাজারের বেআইনী নির্মাণের রমরমা, ডায়মন্ডহারবার মহকুমার পারুলা গ্রামে তৃণমূল-সিপিএম নেতাদের ব্যবস্থাপনায় হিন্দুদের উপর লেভি চাপানর ঘটনাগুলির পাশাপাশি মনমোহন-সনিয়ার ঘোষণা স্থান পেয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ঘোষণা করেছেন, দেশের সম্পদের উপর সংখ্যালঘুদেরই প্রথম অধিকার! ডঃ সিং পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আগত উদ্বাস্তু। তাঁর পিতামহ মুসলমানদের দ্বারা নিহত হলে তাঁর পিতামহী নাতিকে নিয়ে ভারতে চলে আসেন।

দেশে দেশে সন্ত্রাসে বিবরণ দিয়ে লেখক জানাচ্ছেন, (সন্ত্রাসীরা) 'প্রত্যেকেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং এরা সকলেই জেহাদি।' এর পরে ইসলামী ধর্মগ্রন্থ থেকে সন্ত্রাসীদের প্রেরণা পাওয়ার তথ্য দিয়ে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোনের উক্তি— 'যত দিন কুরআন আছে, ততদিন পৃথিবীতে শান্তি নেই।' (পৃ-২৬)

প্রতিটি হিন্দুর অবশ্যপাঠ্য পুস্তকের একটি হয়ে উঠেছে আলোচ্য বইটি। হ্যাঁ, তবে 'মন্টুবাবু'-দের জন্য নয়। মন্টুবাবু হলেন লেখকের প্রতিবেশী, গঙ্গাতীরে প্রাতঃভ্রমণে প্রায় নিত্যদর্শী। লেখক তাঁকে 'স্বস্তিকা', 'ওবিসি সংবাদ' ইত্যাদি পড়তে দিয়ে 'সাম্প্রদায়িকতা' দোষে দুষ্ট খ্যাত হলে যুক্তি-তর্কে নামেন। বহু তথ্য বাবুটিকে দেওয়ার পরে 'একটু গুম হয়ে থাকলেন'। তারপর 'আচ্ছা আমার একটু কাজ আছে' বলে প্রস্থান করলেন। বেশ বুঝলাম কুরআন হাদিশ পড়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ওঁর নেই।...' (পৃ-৭৫)

মোট ১২০ পৃষ্ঠার বইতে পরিশিষ্ট ৩৫ পাতা জুড়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রের খবর। প্রত্যেকেরই সংগ্রহে রাখার মতো। এগুলি ইসলামীস্তানের পথে বাধাস্বরূপ। অবশ্য বইটি সুলভও হওয়া চাই।

ইসলামীস্তানের পথে হিন্দুস্থান
লেখক : শ্রী শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
মূল্য : ১০০ টাকা
প্রকাশক : প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু
পি-৪৭, এল আই সি টাউনশিপ মধ্যমগ্রাম, কলকাতা-৭০০১২৯

কংগ্রেসের অপরিণামদর্শী রাজনীতি

পৃথক রাজ্যের দাবি আগুন ছড়াতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাহাড় সমস্যার সাময়িক সমাধান হয়েছে বলে পশ্চিমবঙ্গবাসীরা উৎফুল্ল হতে পারেন, কিন্তু আপামর ভারতে তেলেঙ্গানার বিধায়কদের একযোগে সাম্প্রতিকতম পদত্যাগের পর ছোট রাজ্যের দাবীতে দেশব্যাপী অশান্তির আশঙ্কা প্রবলভাবে দেখা দিচ্ছে। আজকে প্রায় মাসখানেক হতে চলল তেলেঙ্গানা সমস্যা আবার নতুন করে উদয় হয়েছে। যার দায় কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার কোনওভাবেই এড়াতে পারে না। অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা অঞ্চল থেকে নির্বাচিত ১১৯ জন বিধায়কের মধ্যে ১০০ জনই পদত্যাগ করেছেন। এরমধ্যে ৪৪ জনই কংগ্রেসের। যদিও তাতে ১৯৪ সদস্যের অন্ধ্র বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়া আটকাচ্ছে না কংগ্রেসের।

কিন্তু এতজন বিধায়কের একসঙ্গে পদত্যাগে যে অচিরেই সাংবিধানিক সঙ্কট তৈরি করবে রাজ্যে, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তেলেঙ্গানার ৯ জন কংগ্রেসী সাংসদ পদত্যাগ করলে লোকসভায় দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী, সেক্ষেত্রে সমাজবাদী পার্টি বা বহুজন সমাজ পার্টির সমর্থনের দরকার পড়বে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য।

তেলেঙ্গানা সমস্যার পাশাপাশি বিভিন্ন ছোট রাজ্যের দাবীও ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে আবার নতুন করে ছড়িয়ে পড়েছে। নতুন করে, কারণ ২০০৯ লোকসভার ভোটের ঠিক আগে এরাজ্যের দার্জিলিং সহ অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা প্রভৃতি রাজ্যে আচমকাই পৃথক রাজ্যের দাবী মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। পৃথক রাজ্য মানেই বিচ্ছিন্নতাবাদ নয়, দেশভাগ নয় বরং প্রশাসনিক সুবিধের একটা সুযোগ এতে রয়েছে— এই ভাবনাটা গড়ে তোলার কোনও অবকাশ ইউ পি এ সরকারের কর্তা-ব্যক্তিরা তখন দেননি। সুযোগ মতো তাঁরা এগুলোকে ব্যবহার করেছেন। যেমন ধরুন গোর্খাল্যান্ডপন্থীরা বিজেপির পেছনে রয়েছে তো বিচ্ছিন্নতাবাদের ধুয়ো তুলে দাও, আবার তেলেঙ্গানা- পন্থীরা কংগ্রেসের পেছনে আছে মানে গালভরা, অবাস্তব প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটে ফায়দা লোটো!

কেন্দ্রীয় সরকারের এই 'দ্বিমুখী নীতি'র জন্যই আজ এত সমস্যা। কেন্দ্রে কংগ্রেসী তাবড়নেতা, এ আই সি সি সদস্য, সোনিয়া গান্ধীর অতি ঘনিষ্ঠ কেশব রাওকে পর্যন্ত দলীয়পদে ইস্তফা দিতে হয়েছে। কারণ একটাই জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির বিশাল চাপ সামলাতে না পারা। এত বিধায়ক ও সাংসদ ইস্তফা দিলেন স্রেফ জনগণের চাপ সামলাতে না পেরে। বর্তমানে ন'-দশটি এমন ছোট রাজ্যের দাবী ইতিমধ্যেই উঠে গিয়েছে যেখানে সরকার পক্ষেরও বহু সাংসদ রয়েছেন (সারণী দ্রষ্টব্য)। নির্বাচনোত্তর প্রতিশ্রুতির চাপ সামলাতে না পেরে তাঁরাও ইস্তফা দিলে কেন্দ্রের ইউ পি এ-২ সরকার শুধু বিপন্নই হবে না, সারা দেশেই একটা অদ্ভুত সঙ্কট সৃষ্টি করবে যেটা বর্তমান দুর্নীতি আর সন্ত্রাসের আবহ-এর তুলনায় দেশের নিরাপত্তা ক্ষেত্রে আরও বড়-সড় ফাটলের সৃষ্টি করবে।

আসলে এনিয়ে কেন্দ্র সরকারের রাজনীতি করা বাদে সরকারি তরফে সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক পরিকল্পনা ও নীতি-প্রণয়নে কোনও পদক্ষেপ-ই নেওয়া হয়নি বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। আর এই কারণেই আজ দেশজুড়ে তৈরি হয়েছে নতুন ধরনের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি।

পৃথক রাজ্যের দাবী

মূল রাজ্য	প্রস্তাবিত পৃথক রাজ্য	জনসংখ্যা	সাংসদ
উত্তরাখণ্ড	হরিৎ প্রদেশ	৫ কোটি	২২
মধ্যপ্রদেশ	বুন্দেলখণ্ড	৫ কোটি	১০
উত্তরপ্রদেশ	পূর্বাঞ্চল	৬.৬৬ কোটি	২৩
বিহার	মিথিলাঞ্চল	৪ কোটি	১১
মহারাষ্ট্র	বিদর্ভ	২.৬৩ কোটি	১০
পশ্চিমবঙ্গ	গোর্খাল্যাণ্ড	৩০ লক্ষ	১
অন্ধ্রপ্রদেশ	তেলেঙ্গানা	৩.২ কোটি	১৭
অসম	বোড়োল্যান্ড	৩০ লক্ষ	১
গুজরাট	কচ্ছ	১.৫ কোটি	১

ত্রিপুরায় বাম সরকারের বিপিএল কার্ড কেলেঙ্কারি ফাঁস

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ত্রিপুরাতেও বিপিএল কার্ড নিয়ে রাজ্য সরকারের কেলেঙ্কারি প্রকাশ হয়ে পড়ল। মনুবাজার থেকে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গেছে প্রত্যন্ত সাব্রুম মহকুমার সাতচাঁদ এবং রূপাইছড়ি ব্লকের খোদ সরকারি কর্মচারীদের কাছ থেকে সর্বমোট ৭০০টি বিপিএল কার্ড উদ্ধার হয়েছে। সরকারি কর্মচারী হিসেবে বেতন সহ সবরকম সুযোগ-সুবিধা নেওয়ার পরও তারা 'বিপিএল' কার্ডের সুবিধা ভোগ করে আসছিল। সরকারি দলের সমর্থক না হলে এরকম কাজ অসম্ভব। কোনও কোনও সরকারি কর্মীর একই পরিবারে দুটো বিপিএল কার্ডও পাওয়া গেছে। এখন প্রশ্ন উঠেছে কিভাবে সরকারি কর্মচারীদের ঘরে 'বিপিএল কার্ড' পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এদিকে রূপাইছড়ি ব্লকের জনৈক সরকারি কর্মচারী ও শাসক দলের নেতার বক্তব্য— ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে গ্রামের সিপিএম নেতারাই পছন্দের লোকেদের যেমন বিপিএল কার্ড বিলিয়েছেন তেমনই সরকারি কর্মীদেরও দেদার বিপিএল কার্ড দিয়েছেন। ফলে ওই কার্ডের দৌলতে সরকারি কর্মীরাও বছরের পর বছর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে গেছেন। সাব্রুম মহকুমায় বিপিএল কার্ড নিয়ে কেলেঙ্কারির সংবাদ বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। যে সকল গরীব মানুষ দিনে দু'বার অন্ন জোটাতে পারে না তারা শাসকদলের সমর্থক না হওয়াতে তাদের বিপিএল কার্ড জোটেনি। উল্টে বিত্তবান, শাসক দলের প্রভাবী নেতারা বিপিএল কার্ড পেয়েছেন। জোতদার, রাবার বাগানের মালিকরাও বিপিএল কার্ড পেয়েছেন। এছাড়া মনু-বনকুলের কংগ্রেস নেতারা ওই সব কার্ড বাতিলের দাবীতে দরবার করলেও কাজের কাজ হয়নি। সাব্রুম মহকুমার সাতচাঁদ ব্লক থেকেই উদ্ধার হয়েছে এরকম প্রায় তিনশ বিপিএল কার্ড। খাদ্য দপ্তরের কর্মীরাই এসব উদ্ধার করেছেন। এই ঘটনা আগামী বিধানসভায় পরিবর্তনের সংকেতও হতে পারে। বিগত বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে গণহারে দলীয় ক্যাডারদের বিপিএল কার্ড দেওয়া হয়েছিল বলেও জানা গেছে।

শ্যামাপ্রসাদ-চর্চা

বিগত ৪ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যায় স্বস্তিকা পত্রিকায় শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধের নাম উল্লেখিত হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে উৎসাহী পাঠককুল এই বরেণ্য দেশ নেতা সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যাদি জানতে পারবেন।

তবে এই প্রসঙ্গে দুটি গবেষণামূলক গ্রন্থের নাম পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখছি। প্রথমটি হলো Cambridge University Press থেকে প্রকাশিত ডঃ প্রশান্ত কুমার চ্যাটার্জি রচিত Dr. Syamaprasad Mookerjee and Indian Politics : An Account of an outstanding Political Leader. এইগ্রন্থে দেশ ও বিদেশের প্রামাণ্য ঐতিহাসিক সূত্র থেকে তথ্য চয়ন করা হয়েছে। এছাড়া আমার পি এইচ ডি ডিগ্রির গবেষণার বিষয় ছিল struggle and strife in urban Bengal. এই গ্রন্থে ভারত ছাড়ো আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা প্রভৃতি বিষয়ে শ্যামাপ্রসাদের বীরোচিত ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। কলকাতার দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি গ্রন্থটির প্রকাশক।

—প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়,
কলকাতা-৭০০০৬৪।

মাদ্রাসা অনুমোদন

ইসলামি মতবাদের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের দাবি তিনি আল্লাহর রসুল অর্থাৎ আল্লাহর বাণীপ্রাপ্ত। তাঁর দ্বারা প্রচারিত উক্ত বাণীসমূহের সংকলনের নাম 'কোরাণ'। সাড়ে ছয় হাজারের বেশি আয়াত বা বাক্য কোরাণে আছে। এই আয়তাগুলির কয়েকটি :

১। আল্লাহর নিকট অবিশ্বাসকারীরাই (অর্থাৎ অমুসলমানরা, হিন্দু তো বটেই) নিকৃষ্ট জীব যেহেতু তারা (ইসলাম ও নবীকে) অবিশ্বাস করে। (৮/৫৫)

২। "তোমরা তাদের (অমুসলমানদের) সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ধর্ম (ইসলাম) প্রতিষ্ঠিত না হয়... (২/১৯৩; ৮/৩৯)

অমুসলমানদের প্রতি অনুরূপ হিংসা, ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ অজস্র কথা কোরাণ ও হাদিসে আছে। মাদ্রাসা ইসলাম ধর্মভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেখানে মূল পাঠ্য বিষয় কোরাণ ও হাদিস। তাহলে উপরোক্ত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টিকারক এবং ভারতীয় সংবিধান বিরোধী কথায় ভরপুর কোরাণ, হাদিস শেখানো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসাকে সরকারীভাবে অনুমোদন দেওয়া প্রকারান্তরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট তথা ভারতীয় সংবিধান লঙ্ঘন করা হয় নাকি? বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে কিছুদিন ধরে প্রচারিত হচ্ছে

নবগঠিত তৃণমূল কংগ্রেস সরকার দশ হাজার মাদ্রাসার অনুমোদন দেবে। আমাদের দাবি শুধু ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের তুষ্টির জন্য এই অনুচিত ও ভয়ানক কাজ হতে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার নিবৃত্ত হোক।

—কমলাকান্ত বণিক, দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগণা।

ঢাকা নামের সন্ধানে বুড়িগঙ্গা

বুড়িগঙ্গার উত্তরতীরে অবস্থান করছে ঢাকা মহানগর। মূল বিষয়ে ঢোকার আগে নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদনদী সম্পর্কে কিছু জানা দরকার। ভারত থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ বাংলাদেশের উত্তরাংশে প্রবেশ করার পর দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। প্রথমভাগ অর্থাৎ পুরাতন ব্রহ্মপুত্র পূর্ব-দক্ষিণে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে মেঘনা নদীর সঙ্গে মিলেছে। আবার ব্রহ্মপুত্রের দ্বিতীয় ধারা যমুনা বা যবুনা নামে পরিচিত হয়ে প্রায় সোজাসুজি দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে পাবনা জেলায় পদ্মা নদীর সঙ্গে মিলেছে। পদ্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগে যমুনা থেকে ধলেশ্বরী নামে শাখানদী বের হয়ে ঢাকা জেলায় প্রবেশ করেছে। এই জেলায় ধলেশ্বরী থেকে শাখানদী বুড়িগঙ্গা বের হয়ে ঢাকা নগরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে বয়ে নারায়ণগঞ্জের নিকট আবার ধলেশ্বরীতেই মিলে গেছে। ধলেশ্বরী-বুড়িগঙ্গার মিলিত ধারা প্রথমে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের শাখা শীতলক্ষ্যার সঙ্গে মিলেছে। এই মিলিত ধারা পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে মেঘনার সহিত মিলে, দক্ষিণ দিকে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

এখন আমাদের অতীতের দিকে ফিরতে হবে। বিশেষ করে পদ্মার অতীত গতিপথ জানা দরকার। Vanden Brouke (1660 A.D.)-র নক্সা থেকে জানা যায়, পদ্মার প্রাচীনপথ রাজশাহীর রামপুর, বোয়ালিয়ার পাশ দিয়ে চলন বিলের ভিতর দিয়ে ধলেশ্বরীর খাত ধরে ঢাকা দিয়ে মেঘনার খাড়ি হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশত। উল্লেখ্য, বাংলা রামায়ণের রচয়িতা কবি কৃত্তিবাস (পঞ্চদশ শতাব্দী) গঙ্গার দুটি ধারার উল্লেখ করেছেন। ছোটগঙ্গা আর বড় গঙ্গা। গঙ্গার দক্ষিণমুখী ধারা ভাগীরথী 'ছোটগঙ্গা' এবং পূর্ব- দক্ষিণমুখী ধারা পদ্মা 'বড়গঙ্গা' নামে পরিচিত ছিল। এই বড়গঙ্গাই প্রবাহিত হোত ঢাকার দক্ষিণ দিক দিয়ে। এই বড়গঙ্গা অর্থাৎ বিপুল জলরাশির পদ্মাধারা বর্তমানে উত্তর থেকে দক্ষিণে অর্থাৎ নীচের দিকে সরে গিয়ে মুন্সিগঞ্জ ও শরিয়তপুর জেলাদ্বয়ের সীমারেখা রূপে প্রবাহিত হয়ে মেঘনার সঙ্গে মিলেছে। বড়গঙ্গা দক্ষিণের নতুন পথে প্রবাহিত হওয়ার পুরনো পথের বড়গঙ্গা হয়ে যায় বুড়িগঙ্গা। লক্ষণীয়, পদ্মা-গঙ্গার জল ছাড়াই বুড়িগঙ্গা বড়গঙ্গা অর্থাৎ প্রাচীন পদ্মা-গঙ্গার স্মৃতি বহন করে চলছে।

ঢাকা নগর নাম নিয়ে অন্যতম মত হলো, সুবেদার ইসলাম খান (১৬০৮) যখন ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন, তখন এই এলাকায় ঢাক বাজানোর নির্দেশ দেন। যতদূর ঢাকের আওয়াজ শোনা যাবে, তত দূরই তিনি ঢাকা রাজধানীর সীমানা নির্ধারণ করেন। এই ঢাক বাজানো থেকে নামটি ঢাকা আসতে পারে। আর এক মতে এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ঢাক গাছ ছিল। এই ঢাক গাছ থেকে ঢাকা নাম আসতে পারে। এছাড়া অন্যান্য মতামত রয়েছে।

ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি, বিপুলা পদ্মার গতিপথ পরিবর্তনের ফলে প্রাচীন পদ্মা বা বড়গঙ্গার জলের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নদীর জলস্তর নেমে যায়। জলস্তর নেমে যাওয়ায় জেগে উঠে নদীর তীরভূমি। জলে ঢাকা স্মৃতির জন্য তীরভূমির নাম হয় জলেঢাকা বা ঢাকা। ঢাকা নগরের প্রাচীনতম অংশ গড়ে উঠেছিল বুড়িগঙ্গার তটে, জেগে ওঠা তীরভূমিতেই। বর্তমানে এই তীরভূমি বন্যাপ্রবণ যা জলে ঢাকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া ঢাকার অদূরেই অবস্থান করছে রামপাল গ্রাম। এই রামপাল গ্রামকে সেনরাজাদের (দ্বাদশ খৃস্টাব্দ) রাজধানী মনে করা হয়। এই রাজধানীর অবস্থান হওয়ার কথা বর্তমান বুড়িগঙ্গার তীরে, কিন্তু সেই সময় তীরভূমি জলে ঢাকার জন্য ঢাকার অদূরে অবস্থান করছে। বলার তাৎপর্য হচ্ছে প্রাচীনকালে বর্তমান বুড়িগঙ্গার তীরভূমি জলে ঢাকা ছিল। পদ্মার গতিপথ পরিবর্তনের ফলে বুড়িগঙ্গার তীরে ভূখণ্ডের উদয় হয়। এই উদিত ভূখণ্ডে গড়ে উঠেছে মধ্যযুগের ঢাকা মহানগর।

—রাজকুমার জাজোদিয়া, কালিয়াগঞ্জ,
উত্তর দিনাজপুর।

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী, ঈশ্বর ও বাঙালী হিন্দু সমাজ

নীতীন রায়

কম্যুনিস্ট তাত্ত্বিকেরা পশ্চিমবাংলাসহ ভারতবর্ষের জনমানসে ঈশ্বরবিরোধী ভাবনা নানা কৌশলে প্রয়োগ করে থাকে। তাদের ভাবনায় ঈশ্বর বিশ্বাস কুসংস্কার। তাই ঈশ্বর ভাবনাই বিজ্ঞান-বিরোধী। তাদের মতে বিজ্ঞান ও ধর্মের পাশাপাশি অবস্থান সম্ভব নয়। নাস্তিকতা ও ধর্মবিরোধী হওয়া নাকি প্রগতিশীলতার লক্ষণ। কম্যুনিস্টরা সমস্ত হিন্দু সমাজকে হিন্দুবিরোধী করে অহিন্দু করে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। তাই দুর্গাপূজা শারদোৎসবে পরিণত হয়েছে। পূজা মণ্ডপে শ্রদ্ধাবোধ-কে সরিয়ে আনন্দ স্ফূর্তির স্থান হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে হিন্দু সমাজ। ইসকনের বৈদিক জ্যোর্তিবিজ্ঞানের গবেষণা আটকে দেয় বামপন্থী সরকার এবং অন্যদিকে অনুমোদিত ও অননুমোদিত মাদ্রাসা চলছে প্রায় ১২ হাজার। হিন্দুদের উপর আক্রমণ এক তরফা ছিল। পশ্চিমবাংলার এককালের মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী তারাপীঠের মন্দিরে মায়ের পায়ে ফুল দিয়ে ধিকৃত হয়েছিলেন। অন্যদিকে নিয়মিত নমাজ পড়ে ও সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে কমরেড হয়েছিলেন কলিমুদ্দিন শামস। হিন্দুদের বিভ্রান্ত করার জন্য যুক্তিবাদী বিজ্ঞান মঞ্চ নামে একটি সংগঠন তৈরি হয়। তাদের কাজ হিন্দু পাড়াতেই বিস্তৃত ছিল। আবার পশ্চিমবাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাকেও হিন্দুবিরোধী করে তোলা হয়। তাই বাঙালী হিন্দু নিজেকে বিজ্ঞানপ্রেমী ভাবতে গিয়ে ধর্মবিরোধী করে গড়ে তোলে।

প্রাচীনকাল থেকেই বিজ্ঞানীরা ছিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসী। জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও ছিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসী। তিনি মনে করতেন প্রকৃতি ও ধর্মগ্রন্থ ঈশ্বরীয় বাণী হতে প্রেরণা লাভ করে। স্যার আইজাক নিউটন মনে করতেন বিশ্বের সৌরমণ্ডল তারাবাজি ও ধূমকেতুগুলো এক অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্বের দ্বারা তৈরি হয়েছে। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেন, আমি জানতে চাই ঈশ্বর কি পদ্ধতিতে বিশ্বসৃষ্টি করেছেন? আমি মনে করি, ঈশ্বর আমাদের নিয়ে পাশা খেলছেন না। বিজ্ঞানীরা এই বিশ্বাস রাখুন বিশ্বসৃষ্টির অপরিবর্তনীয় নিয়ম রক্ষার জন্য চেতন সত্ত্বা রয়েছে যা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী বি ডি জোসেফসনের মতে আমরা যখন কোয়ান্টাম স্তরে প্রবেশ করবো তখন বিজ্ঞানের কাঠামোটি ভগবানের উপস্থিতি ও

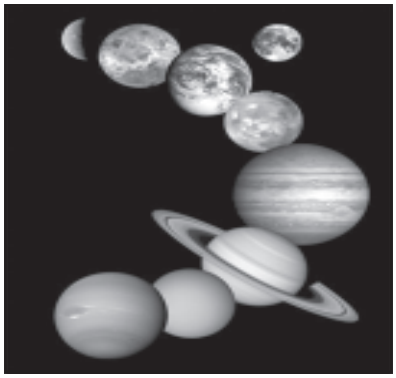

গীতা ও বৈদিক জ্ঞান আলোচনা করে বিজ্ঞানী কার্ল স্যাগন বলেন, মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে ভারতের ভাবনা অত্যন্ত উন্নত স্তরের। তিনি আরও বলেন, হিন্দুধর্ম (বেদভিত্তিক) একমাত্র ধর্ম যেখানে (বিশ্বের সৃষ্টি ধ্বংস সম্পর্কিত) সময় সারণী বৈজ্ঞানিক মহা বিশ্বতত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই আমরা বলতে পারি, হিন্দুধর্ম ও বিজ্ঞানের সঙ্গে কোনও বিরোধ নেই।

কার্যকলাপের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। বিজ্ঞানী স্যার পেনরোজ বলেন, বিশ্বসৃষ্টি কোনও আচমকা ঘটনা নয়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির উদ্দেশ্য রয়েছে। নোবেলবিজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী আর্থার এল স্কানো বলেন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অভূতপূর্ব বিস্ময়গুলো নিয়ে যখন ভাবি তখন দেখি শুধু কিভাবে হলো তা নয়, কেন হলো, তা নিয়ে ভাবতে হবে।

তার উত্তর খুঁজতে হয় ধর্মের পরিধির ভিতর, তখন ভগবানের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারি। স্টিং থিয়োরীর প্রবক্তা হকিংস বলেন, এই বিশ্ব প্রকাশ কেন হলো তার উত্তর পেলে আমরা জানতে পারবো সৃষ্টির সময় ঈশ্বরের মনের চেহারাটা কেমন ছিল।

বিজ্ঞানী জিম হল্ট দি ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে 'Science Resurrects God' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি এই প্রবন্ধে Nature পত্রিকার একটি Survey এর কথা উল্লেখ করেন। ওই সমীক্ষায় জানা যায় আমেরিকার ৪০ শতাংশ বিজ্ঞানী ঈশ্বরে বিশ্বাসী, আবার তাঁরা শুধু বিশ্বাসই করেন না প্রার্থনাও করেন। যতই বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে ততই বিজ্ঞানীরা ঈশ্বর বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। স্টিং থিয়োরী— থিয়োরী অব এভরিথিং নামে নামে পরিচিত। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বিজ্ঞানীরা বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত নিয়ম একটি সূত্রে গাঁথা। অর্থাৎ এই নিয়মটি জানতে পারলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রহস্যের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। আবার Oscillating theory অনুযায়ী বিশ্বপ্রকাশ বিন্দু থেকে বর্ধিত হবে, সৃষ্টি হবে ব্রহ্মাণ্ডের আবার বিশ্বপ্রকাশ ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হবে। আমরা জানি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন— 'ঈসাব্যাসং মিদং জগতং যৎকিঞ্চ' অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত। জীব ও জড় একই ঈশ্বর দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত। আর হিন্দুরা বিশ্বাস করে কল্প সুষুপ্তি থেকে সৃষ্টি হয় আবার ধ্বংস হয়ে যায়। ঋষিরা যেন Oscillating theory-র কথাই বলেছেন। গীতা ও বৈদিক জ্ঞান আলোচনা করে বিজ্ঞানী কার্ল স্যাগন বলেন, মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে ভারতের ভাবনা অত্যন্ত উন্নত স্তরের। তিনি আরও বলেন, হিন্দুধর্ম (বেদভিত্তিক) একমাত্র ধর্ম যেখানে (বিশ্বের সৃষ্টি ধ্বংস সম্পর্কিত) সময় সারণী বৈজ্ঞানিক মহা বিশ্বতত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই আমরা বলতে পারি, হিন্দুধর্ম ও বিজ্ঞানের সঙ্গে কোনও বিরোধ নেই। বিজ্ঞান যেন হিন্দুধর্মের দ্বারে আঘাত করছে ও বলছে 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে'।

ষোড়শ মহাজনপদ

পাঞ্চাল ও বৎস

গোপাল চক্রবর্তী

পাঞ্চাল—মহাভারতের যুগ থেকেই পাঞ্চাল রাজ্য এক সুপ্রসিদ্ধ জনপদরূপে খ্যাত ছিল। বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা যমুনা দোয়াবের কিছু অংশ ও রোহিলাখণ্ড নিয়ে এই জনপদ গঠিত ছিল। পাঞ্চালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গা পাঞ্চাল জনপদকে দুই ভাগে ভাগ করেছিল। এর উত্তর-তীরবর্তী অঞ্চলের নাম উত্তর পাঞ্চাল ও দক্ষিণ-তীরবর্তী অঞ্চলের নাম দক্ষিণ পাঞ্চাল। উত্তরের রাজধানী ছিল অহিচ্ছত্র, বর্তমান বেরিলী জেলার রামনগর ও দক্ষিণের রাজধানী ছিল কাম্পিল্য। ফরাক্কাবাদ জেলার অন্তর্গত কাম্পিল্য বা কম্পিল।

মহাভারতের কাহিনীতে আমরা পাই পাঞ্চালের নৃপতি ছিলেন মহাশক্তিধর দ্রুপদ। তাঁর কন্যা দ্রৌপদী বা পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর সভায় ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে পত্নীরূপে লাভ করেন। পরে মাতা কুন্তীর আদেশে দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নীরূপে গৃহীতা হন। মহাভারতে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে পাঞ্চালের সমৃদ্ধি ও বৈভবের পরিচয় শুধু সমৃদ্ধ জনপদেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এর সামরিক শক্তিও ছিল বিশাল। মহাভারতের যুদ্ধে পাঞ্চাল পাণ্ডবদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। মহাভারতের যুদ্ধে দ্রুপদ পুত্র শিখণ্ডী (নপুংসক) কুরুসেনাপতি ভীষ্মবধের কারণ হয়েছিল এবং দ্রুপদের আরেক পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরব পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু এবং কুরু-সেনাপতি দ্রোণাচার্যকে বধ করেছিলেন।

মহাভারতের যুগ থেকে খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত কুরু ও পাঞ্চালের মধ্যে ঘন ঘন যুদ্ধ বিগ্রহ হোত বলে জানা যায়। বিখ্যাত নগর কান্যকুব্জ বা কনৌজ পাঞ্চাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথমদিকে এই রাজ্যে শক্তিশালী রাজতন্ত্র বলবৎ থাকলেও পরে অর্থাৎ খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতকে এখানে প্রজাতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল।

বৎস—বৎস রাজ্যটি ছিল উত্তর প্রদেশের গাঙ্গেয় সমভূমিতে অবস্থিত। এলাহাবাদের কাছে যমুনা নদীর তীরে কোশাম্বী নগর ছিল

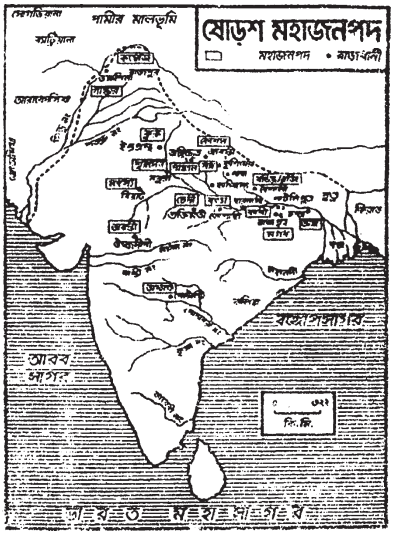

বৎস রাজ্যের রাজধানী। বৎসদের উৎস কাশীর এক রাজা। বৌদ্ধ গ্রন্থানুসারে, জটিল সম্প্রদায়ের বাবরী সশিষ্যে বৎসে এসেছিলেন। কোশাম্বীর ঘোষিতারামা মঠে পিণ্ডোরা ভরদ্বাজ বাস করতেন। তিনি ছিলেন কোশাম্বীর রাজ-পুরোহিতের পুত্র। বুদ্ধ ঘোষিতারামা মঠে কিছুদিন অবস্থান করে শিষ্যদের উদ্দেশ্যে ধর্ম উপদেশ দিয়েছিলেন।

অতি উন্নত কৃষি ও উৎকৃষ্ট কার্পাস শিল্পের জন্য বৎসরাজ্য অর্থনৈতিক ভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। বৎসরাজ উদয়ন খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের মতো বৎসরাজ উদয়নও

ছিলেন কিংবদন্তীর নায়ক। উদয়নের সঙ্গে অবন্তীরাজ প্রদ্যোৎমহাসেনের বৈরীতার অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। পত্নী বাসবদত্তাগত প্রাণ উদয়ন বিশ্বস্ত মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের রাজনৈতিক কৌশলে অবন্তীর রাজকন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করেছিলেন। এই কাহিনী নিয়ে নাট্যকার ভাস 'প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ' ও 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নামে দুটি বিখ্যাত নাটক রচনা করেছিলেন। এই নাটক দুটিতে সমসাময়িক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবস্থার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। রাজা হর্ষবর্ধনের 'রত্নাবলী' ও 'প্রিয়দর্শিকা' নামে নাটক দুটির নায়কও বৎসরাজ উদয়ন। এই নাটক দুটিতেও সমসাময়িক ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়। 'কথাসরিৎসাগর'-এ উদয়ণের দিগ্বিজয়ের কাহিনী বর্ণিত আছে। প্রথম জীবনে বৎসরাজ উদয়ন ছিলেন চরম বৌদ্ধ বিদ্বেষী। পরবর্তীকালে তিনি ভগবান বুদ্ধের আদর্শ ও মহানুভবতায় আকৃষ্ট হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। জাতকের কাহিনী থেকে জানা যায় যে তাঁর পুত্র বোধি সুমসুমার গিরিতে বাস করত। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এখানকার ভগ্‌গ রাজ্যটি বৎস রাজ্যের অধীন ছিল।

নাটোর রাজবাড়ি

সাধক ও দস্যু

নির্মল কর

নাটোরের রাণী ভবানীর দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণ রায়কে বসানো হলো রাজমর্যাদার আসনে। যেহেতু রাজ্য পরিচালনায় তাঁর দক্ষতার অভাব ছিল না, তাঁরই শাসন-ব্যবস্থায় শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে বিশাল জমিদারিতে।

কিন্তু এত ঐশ্বর্য-বৈভবের অধিকারী হয়েও রাজারামকৃষ্ণ বিষয় বাসনায় নিজেকে ডুবিয়ে দেননি। সুন্দরী বধূতেও তিনি নিস্পৃহ। ক্রমশ সাধন-পথে এগিয়ে যেতে লাগলেন রাজা। প্রতিষ্ঠা করলেন মন্দির, যেখানে অধিষ্ঠিত শ্যামা মায়ের পূজার্চনা চলে নিত্যদিন। ধন্য রাজা রামকৃষ্ণ। কারণ একাধারে তিনি রাজা ও যোগী। প্রজাদের সুখ-দুঃখের প্রতি যেমন দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, তন্ত্রসাধনাতেও গভীর মনোনিবেশ তাঁর। প্রতি বছর বিশেষ এক অমাবস্যা তিথিতে শ্যামার মূর্তিকে বহুমূল্য অলঙ্কারে সজ্জিত করেন। গভীর রাতে হয় সাড়ম্বরে ব্রহ্মময়ী শ্যামার পুজো। পুজোর পর গরিব দুঃখীদের মধ্যে অন্ন বস্ত্র ধন বিতরণ করেন। অমাবস্যার মধ্য রাতে রামকৃষ্ণ যখন পুজোয় বসেন মন্দিরে তখন বেশি দর্শনার্থী থাকে না। একবার এমনই এক বিশেষ তিথিতে মধ্যরাতে রামকৃষ্ণ পুজোয় নিমগ্ন। হঠাৎ তাঁর তন্ময়তা কেটে যায়। হা রে রে রে করে একদল সশস্ত্র ডাকাত মশাল হাতে উঠে এল মন্দির প্রাঙ্গণে। উদ্দেশ্য বিগ্রহের অলঙ্কার এবং মন্দিরের মজুত অর্থ লুঠ করা। সাধক-রাজা রামকৃষ্ণের যোগনিদ্রা ভঙ্গ হলো। স্তব্ধ চকিত-চোখে তাকালেন লাল চোখের ডাকাতদের দিকে। ডাকাতরা কোলাহল করতে করতে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল মন্দিরে। দস্যু সর্দার উচ্চরবে দলের লোকদের হুকুম করল, 'সাধুকে বাহিরে টেনে এনে বেঁধে রাখ। যদি বাধা দেয়, মা কালীর খাঁড়া বসিয়ে দিবি সাধুর গর্দানে।'

রাজা রামকৃষ্ণ চুপ করে বসে রইলেন আসনে, মায়ের চোখে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ। এতটুকু ভয় পেলেন না। শুধু অস্ফুট জলদ-গম্ভীর সুরে দু'টি শব্দ গমগম করে উঠল 'মা ব্রহ্মময়ী!' সেই সুর বজ্ররবে ধ্বনিত হলো দস্যুদের কর্ণকুহরে। আর যোগীরাজা দেখতে পেলেন অদ্ভুত এক দৃশ্য। আগুয়ান ডাকাতদল দেবীমূর্তির বেদীর কাছে না এসে পিছু হটে গেল। শেষ পর্যন্ত নিঃশব্দে পালিয়েই গেল তারা। সাধক-রাজা রামকৃষ্ণের নির্বিঘ্নে পুজো সমাপিত হলো। পরদিন ঘটল আর এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। সকালবেলা তোড়জোড় চলছে গরিবদের মধ্যে বস্ত্র ও অর্থ বিতরণের। এমন সময় উত্তরবঙ্গের দুর্ধর্ষ দস্যুসর্দার শঙ্করা দলবল নিয়ে ভীরু পদসঞ্চারে হাজির। আজও সবাই সশস্ত্র। কিন্তু নিঃশব্দে সব অস্ত্র মন্দিরের বিগ্রহের সামনে রেখে সবাই লুটিয়ে পড়ল রাজা রামকৃষ্ণের পদতলে। রামকৃষ্ণ সবিস্ময়ে দেখলেন, দস্যু সর্দার হাত জোড় করে বলছে, 'মহারাজ, কাল রাত্রে আমরা মা তারাকে দর্শন করেছি। সার্থক আমাদের জীবন। আমরা আর কোনওদিন ডাকাতি করব না। আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন।"

ডাকাত সর্দারের কথা শুনে রামকৃষ্ণের দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। তিনি কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আমি এতদিন সাধনা করেও মায়ের দেখা পেলুম না, আর মা নিজেই তোমাদের দেখা দিয়েছেন। তোমরা ধন্য।' রাজা রামকৃষ্ণ দস্যুসর্দারকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ক্ষমা করার আমি কে? মা নিজেই তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।' অপার আনন্দ নিয়ে সাশ্রুনয়নে বিদায় নিল দস্যুসর্দার শঙ্করা ও তার দলবল।

পরবর্তীকালে এই শঙ্করা পরম সাধক হয়ে উঠেছিলেন। দলের লোকেরাও সৎ নাগরিক হয়ে শুদ্ধ জীবনযাপন করেছিল। ১৭৯৫ সালে সাধকরাজা রামকৃষ্ণের লোকান্তর ঘটে। এই মহাপুরুষের জন্ম রাজসাহী জেলার আটগ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে। নাটোরে রামকৃষ্ণ রায় পূজিত 'জয়কালী' এককালে জাগ্রত দেবী রূপে পরিচিত ছিলেন।

শৃঙ্গেরী, উডিপি ও ম্যাঙ্গালোর ভ্রমণ

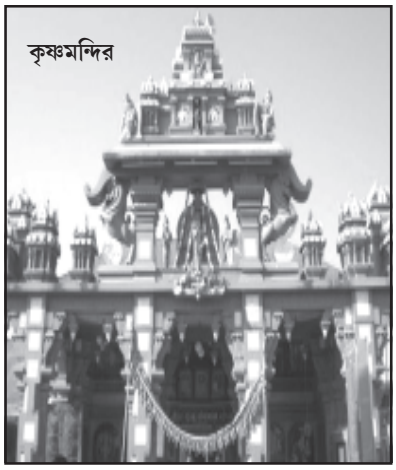
কৃষ্ণমন্দির

তরুণ কুমার পণ্ডিত

ম্যাঙ্গালোর থেকে প্রায় ৬০ কিমি দূরে উডিপি ভারতের মধ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে অনেক মঠ মন্দির থাকলেও বৈষ্ণব শ্রী মাধবাচার্য প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণমন্দির বিখ্যাত। আমরা ম্যাঙ্গালোর থেকে জলযোগ করে এই মন্দির দেখার জন্য সুমোতে করে বের হয়েছিলাম। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই উডিপিতে পৌঁছালাম, তারপর মন্দিরের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখলাম। কৃষ্ণমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী মাধবাচার্যের জন্ম হয়েছিল এই উডিপিতে, নাদুমান ভট্ট পরিবারে। ছেলেবেলা থেকেই তিনি সন্ন্যাস নিয়ে দ্বৈতবাদ প্রচার শুরু করেন। প্রচলিত আছে সমুদ্রতীরে ধ্যানস্থ অবস্থায় একদিন প্রচণ্ড ঝড়ের দিনে একটি ডুবন্ত জাহাজকে শ্রী মাধবাচার্য অলৌকিক ক্ষমতাবলে রক্ষা করেছিলেন। জাহাজের নাবিক সমস্ত সম্পত্তি তাঁকে দান করতে চাইলে মাধবাচার্য কেবলমাত্র ২টি খণ্ড গোপীচন্দন ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করেননি। কারণ, এই গোপীচন্দনেই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের অঙ্গরাগ করা হয়। আচার্যের আটজন শিষ্য শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরের চারিদিকে আটটি মঠ স্থাপন করেছিল সেগুলি আমরা ঘুরে দেখলাম। এখন তাঁরাই পালাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের পূজার ব্যবস্থা করছেন। শ্রীকৃষ্ণ মন্দির দেখার সময় একটি অলৌকিক ঘটনার কথা স্থানীয় পুরোহিত আমাদের বললেন। গর্ভমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি পশ্চিমদিকে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু পশ্চিমদিকে কোনও দরজা ছিল না। উত্তর দিকের দরজা দিয়ে ভক্তরা প্রবেশ করত এবং গর্ভমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করত। একদিন রোহিতাস নামে এক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের দর্শন করতে এলে অস্পৃশ্য বলে পূজারীরা তাঁকে মন্দিরে প্রবেশ করতে বাধা দিল। সেই ভক্তটি তখন মন্দিরের পশ্চিম দিকে বসে ভগবানের চিন্তায় সারারাত্রি কাটিয়ে দিলেন। রাত্রে পূজারীরা মন্দির বন্ধ করে দিয়ে চলে যাওয়ার পর গভীররাত্রে মন্দিরের পশ্চিমদিকে একটি দরজা হয়ে গেল। ভক্ত ভগবানের দর্শন পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সকালে পূজারীরা এই অলৌকিক ব্যাপার দেখল। তারা বুঝল যে ভগবান কৃষ্ণই ভক্তের বাসনা পূর্ণ করেছেন। পূজারীরা ওই ভক্তের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল। সেই পশ্চিমদিকের দরজা আমরাও ভক্তি ভরে দেখলাম। দুপুরের প্রসাদ আমরা উডিপি কৃষ্ণ মন্দিরেই একসঙ্গে বসে (নিঃশুল্ক) গ্রহণ করলাম। সেই প্রসাদের কী অপূর্ব স্বাদ! এরপর গেলাম জেলা শহর সিমোগা থেকে ৬৫ মাইল দূরে ঋষ্যশৃঙ্গ

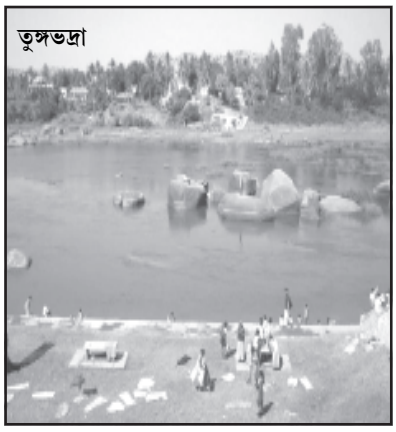
তুঙ্গভদ্রা

পর্বতে। রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল এখানেই। তার নাম অনুসারেই এই স্থানের নাম শৃঙ্গেরী। অদ্বৈতবাদের প্রবক্তা আদি শংকরাচার্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সারা ভারতবর্ষের চারটি প্রধান মঠের একটি রয়েছে এখানে। আমরা সন্ধ্যা ৭টাতে শৃঙ্গেরী পৌঁছে মঠের অতিথিশালাতে থাকার ব্যবস্থা করলাম। এরপর এখানকার বেশ কয়েকটি মন্দির দেখে শংকরাচার্য প্রতিষ্ঠিত প্রধান মন্দির সারদা বা সরস্বতী মন্দির দেখতে গেলাম। আচার্য রামানুজ মহীশূরে এসে এই শৃঙ্গেরীতে প্রায় ১২ বছর কাটিয়েছিলেন। স্বামী বিদ্যারণ্য দীক্ষিত হয়ে এই শৃঙ্গেরী মঠ থেকে বিজয়নগর সাম্রাজ্য স্থাপিত করেছিলেন। সকালবেলাতে আবার এখানকার বিদ্যাশংকর মন্দিরে ১২টি স্তম্ভ দেখতে গেলাম। স্তম্ভগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, বারো মাসই সূর্যকিরণ বারোটি স্তম্ভের উপর পড়ে। মন্দিরের সামনে অবস্থিত পাথরের তৈরি কতকগুলি সিংহের মূর্তির মুখের মধ্যে পাথরের বলগুলি এমনভাবে লাগানো রয়েছে যে বলগুলিকে ঘোরানো যায়। শৃঙ্গেরী মঠের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে তুঙ্গভদ্রা নদী। এই নদীতে গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম তা বাঙালীর রসনাকে একদিকে যেমন উদ্দীপিত করে অপরদিকে দক্ষিণ ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধি করে এই দৃশ্য। নদীর জল খুব বেশী নেই সেখানে অসংখ্য বিশাল বিশাল মাছের মেলা— একটু মুড়ি বা খাবার দিলেই মাছেরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে সেই খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। রুই কাতলা সেই মাছের ওজন এক একটি ১০ কেজির কম হবে না। আমরা দেখলাম নদীতে মাছ মারা নিষিদ্ধ আর এখানকার মানুষরা বেশিরভাগই নিরামিষ ভোজী। অতিথিশালাতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে এই শৃঙ্গেরী মঠের ভোজনশালাতে হাজার ভক্তের সঙ্গে সমবেত ভাবে আমরাও রাতের অন্ন ভোজন করলাম পরম তৃপ্তির সঙ্গে। শেষে ম্যাঙ্গালোরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যালয়ের পাশে বিশাল বাড়িটির কথা বলতে হয় যেখানে শহরের প্রধান সিদ্ধিবিনায়ক (গণেশ) পূজা বিখ্যাত। এবং ১৯৪০ সাল থেকে এই পূজা হয়ে আসছে। সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে এই বিল্ডিংটিতে এক সঙ্গে যেমন ৫০০ লোকের বসার ব্যবস্থা আছে তেমনি ৪ তলা বিল্ডিং-এ থাকার সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা ম্যাঙ্গালোর শহরের প্রধান আকর্ষণ মঙ্গলাদেবীর মন্দির ও কাদ্রি পাহাড়ে শিব মন্দির দেখতে গেলাম। আরব সাগরের তীরে সুন্দর সবুজ পামগাছ ও সবুজে ঘেরা একটি মনোরম সমুদ্র বন্দর এই ম্যাঙ্গালোরের সমুদ্র সৈকতে সূর্যাস্তের দৃশ্যও সকলে উপভোগ করলাম।

এছাড়া এখান থেকে কফি, গোলমরিচ ও কাজুবাদাম বর্হিভারতে রপ্তানী করা হয়।

শতবর্ষের আঙিনায়

বাংলার কিংবদন্তী নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালা

ইন্দিরা রায়

এ বছরটা অর্থাৎ ২০১১ নারী জগতের কাছে সত্যিই গর্বের কারণ, এ বছরে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই কৃতী নারীদের শতবর্ষ হচ্ছে। 'অঙ্গনা'-র পাতায় সাহিত্য জগতের কৃতী সাহিত্যিক, পাণ্ডিত্যে সেরা এমন নারীদের সম্পর্কে তুলে ধরা হয়েছে। এ সংখ্যায় নাট্যজগতের নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালা সম্পর্কে লেখা থাকছে।

একবিংশ শতাব্দীর একের দশকে সরযূবালা দেবীর জন্মশতবার্ষিকীর সূচনা। তাঁর জন্ম ১৯১২-র জানুয়ারি মাসে। সঠিক তারিখ ও বার জানা যায় না। ছোট্ট সরযূ শিশু বয়সেই পিতৃহারা হন, ফলে বাধ্য হয়ে সংসারের প্রয়োজনে শিশুবেলার খেলার দিনগুলোতেই নাটক করতে আসেন। শিশু সরযূর মধ্যে নাট্যপ্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল এবং সেই প্রতিভার বলেই পরবর্তী জীবনে 'নাট্যসম্রাজ্ঞী' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যায় নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তর কিছু মন্তব্য— 'শ্রীমতী সরযূবালা দেবী যতদিন আমাদের মধ্যে আছেন, ততদিন আর কাউকে আমি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীরূপে চিহ্নিত করতে পারব না। মঞ্চে অভিনেত্রী হতে গেলে যে সব গুণ থাকার প্রয়োজন বর্তমানে মঞ্চাভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকেরই তা নেই। মঞ্চে অভিনয় করতে হলে সবরকম চরিত্রে রূপদান করার যোগ্যতা অর্জন করা প্রয়োজন। সে সব গুণের অধিকারী সরযূবালা।'

প্রথম যখন নাট্যাভিনয়ে আসেন ছোট্ট সরযূ এমিনেন্ট থিয়েটারে, 'কুমার সিংহ' নাটকে ভিক্ষু বালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। শুধু অভিনয় দিয়ে নয়, নিজ কণ্ঠে গান করে দর্শকচিত্ত জয় করে নেন। এই সঙ্গে শুধু অভিনয়ে নয়, সঙ্গীতেও যে পারদর্শী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল। এ ব্যাপারে জানা যায়, সরযূবালার সঙ্গীতশিক্ষা পিতা ভূতনাথ দত্তের কাছে। ভিক্ষু বালকের চরিত্রে অভিনয় করেই তিনি পুরস্কৃত হন। রূপোর পদকও লাভ করেন। এরপর একে একে মঞ্চে অভিনয়-এর ক্ষেত্রে সফল হতে থাকেন। অভিনেত্রী হতে গিয়ে তিনি সৌভাগ্যবশত এমন কিছু নাট্যব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন যে ওঁর অভিনেত্রী জীবন সাফল্যমণ্ডিত হতে সময় লাগেনি।

সমগ্র জীবনের দীর্ঘ ষাট বছর কেটেছে তৎকালীন ডাকসাইটে দাপুটে অভিনেতা নাট্য পরিচালক নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ি, নটসম্রাট অহীন্দ্র চৌধুরী, দানীবাবু, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সান্নিধ্যে। কিশোরী সরযূকে তাঁরা নাটকের অনেক কিছুই শিখিয়েছেন স্নেহের আলিঙ্গনে। পরবর্তীকালে বড় পর্দায় কিছু অভিনয় করলেও তাঁর খ্যাতি ও পরিচিতি মঞ্চের শিল্পী হিসেবে। তাঁর অভিনীত বিশিষ্ট চরিত্রগুলো অসংখ্য যা এই ক্ষুদ্র

সরযূবালা অভিনীতি উল্লেখযোগ্য নাটক ও চরিত্র

বিষবৃক্ষ (কুন্দনন্দিনী), পথের শেষে (পারুল), প্রাণের দাবি (অচলা), দক্ষযজ্ঞ (সতী), মহুয়া (মহুয়া), গৈরিক পতাকা (শ্যামলী), চন্দ্রনাথ (আসমান তারা), কারাগার (কঙ্কা); প্রতাপাদিত্য (বিজয়া), মা (অর্জিত), খনা (নামভূমিকা), সিরাজদৌল্লা (লুৎফা), তুলসী (নামভূমিকা); শাজাহান (জাহানারা), দেবদাস (পার্বতী), ধাত্রীপান্না (পান্না), সীতারাম (শ্রী), কাশীনাথ (কমলা)।

পরিসরে উল্লেখ করা যাবে না। তবে তিনি নানা ধরনের চরিত্র রূপায়ণে সাবলীল ছিলেন সে ব্যাপারেও নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত বলেছেন— আজ যিনি ক্রূর চরিত্রে অভিনয় করলেন, কাল হয়ত তাঁকে দর্শকচিত্ত জয় করতে হবে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, অপেরাধর্মী, প্রহসন জাতীয় সর্বপ্রকার নাটকে অভিনয় করার দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। সরযূদেবী যে সময়ে মঞ্চেঅভিনয় করতে এসেছিলেন, তখন উল্লিখিত সর্বপ্রকার নাটক অভিনয় হত। তিনি বহু নাটকে নেচেছেন, গেয়েছেন। বিভিন্ন রসের ও বিভিন্ন স্বাদের বহু চরিত্রে রূপদান করেছেন।

সরযূবালা ১৯২৮-এ সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করেন। তাঁর অভিনয়ে গিরিশযুগের অভিনয়ধারা ও

পরবর্তী যুগের অভিনয়ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পীদের প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা এবং পরবর্তী নবীন শিল্পীদের আপন করে নিতে পেরেছিলেন বলে তিনি সকলের কাছে 'সরযূমা' হয়ে উঠেছিলেন। দক্ষ অভিনেতাদের সান্নিধ্য ও শিক্ষা যখন পেয়েছিলেন, তেমনি যে সময়ের সহযোগী অভিনেত্রী হিসেবে পেয়েছেন তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী, আশ্চর্যময়ী, চুনিবালা, প্রভাদেবীকে। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটক ও চরিত্রগুলো এক নজরে দেখে নেওয়া যাক। যেমন— বিষবৃক্ষ (কুন্দনন্দিনী), পথের শেষে (পারুল), প্রাণের দাবি (অচলা), দক্ষযজ্ঞ (সতী), মহুয়া (মহুয়া), গৈরিক পতাকা (শ্যামলী), চন্দ্রনাথ (আসমান তারা), কারাগার (কঙ্কা); প্রতাপাদিত্য (বিজয়া), মা (অর্জিত), খনা (নামভূমিকা), সিরাজদৌল্লা (লুৎফা), তুলসী (নামভূমিকা); শাজাহান (জাহানারা), দেবদাস (পার্বতী), ধাত্রীপান্না (পান্না), সীতারাম (শ্রী), কাশীনাথ (কমলা)।

সরযূবালা সুন্দরী ছিলেন না। খর্বাকৃতি, মলিন গায়ের রঙ। চেহারায় আকর্ষণ না থাকলেও তাঁর চেষ্টা, নিষ্ঠা ও অনুশীলন অভিনয় ক্ষমতাকে এমন জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল, যা দর্শকদের মন জয় করেছিল। তাঁর অভিনয়ে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা তাঁকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে এবং 'নাট্যসম্রাজ্ঞী' করে তুলতে সাহায্য করেছে। কণ্ঠস্বরে বৈচিত্র্য আনা এবং স্বরপ্রক্ষেপ ধারা। বিচিত্র রসের অভিনয়ে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য। সরযূবালা নাচে গানে অন্য অনেক মধ্যমানের অভিনেত্রীদের মতো হলেও নজরুল ইসলামের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা এবং স্বনামধন্য ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নৃত্যশিক্ষা সরযূর ত্রুটি ঢেকে দিয়েছিল। সরযূবালা বিভিন্ন দলের হয়ে মঞ্চে অভিনয় করেছেন। যখন নাট্য নিকেতনে কাজ করছিলেন, তখনই চলচ্চিত্রে অভিনয় করার ডাক আসে। চলচ্চিত্রে অভিনয় করলেও তাঁর প্রাণ ছিল থিয়েটার। বারে বারেই ফিরে এসেছেন নাট্যমঞ্চে।

নাট্যজীবনে তাঁর পরম পাওনা নির্মলেন্দু লাহিড়ীর মতো একজন শিক্ষক। যিনি সরযূবালাকে অভিনয় জগতে প্রথম পদক্ষেপ থেকেই নানাভাবে সহায়তা করেছেন। পরবর্তী জীবনে সরযূবালাকে সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ ধাপেও মঞ্চাভিনয়ে এতটুকু ক্লান্ত হননি। সত্যিই তিনি নাট্যজগতের এক কিংবদন্তী। ১৯৯৪-এর ২২ জুলাই ৮০ বছর পূর্ণ করে অমরলোকে যাত্রা করেন। বাংলার নাট্য ইতিহাসে তাঁর নাম চিরভাস্বর হয়ে থাকবে নাট্যাভিনেতা ও অন্যান্য কলা-কুশলীদের কাছে। তিনি চিরকালীন, সর্বজনীন।

অরুণা মুখোপাধ্যায়

আইনজীবী জীবনের ৫০ বছর পেরিয়ে এলেন

বিশেষ প্রতিনিধি॥ আইন জগতে শুধু নয়, নারীজগতেও এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—মহিলা আইনজীবী অরুণা মুখোপাধ্যায়ের আইন জীবনে পঞ্চাশতম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে হাইকোর্ট থেকে বিশেষ সম্বর্ধনা। সততা, নিষ্ঠা, স্থৈর্য ও সম্মানের সঙ্গে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় পেরিয়ে এলেন সফল আইনজীবী হিসেবে।

১৭ জুন, শুক্রবার, দুপুর দুটোয় হাইকোর্টে বার অ্যাসোসিয়েশন-২ ঘরে সম্মানীয় পদমর্যাদা সম্পন্ন ন্যায়জ্ঞদের উপস্থিতিতে শ্রীমতী অরুণা মুখোপাধ্যায় সম্বর্ধিত হন। তাঁকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়। উত্তরীয় পরিয়ে দেন ডঃ দেবীপ্রসাদ পাল। বিচারপতি কল্যাণজ্যোতি সেনগুপ্ত আইনজীবী অরুণা মুখোপাধ্যায়ের পরিচিতি তুলে ধরেন এবং সবশেষে বলেন, ওঁকে আমি 'মা' হিসেবে দেখি। উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি দেবাশিস করগুপ্ত, মহিলা বিচারপতি শুক্লা কবির, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সহধর্মিণী বুলু চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্যরা।

১৯৩৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম। বাবা স্বর্গত পূর্ণেন্দুনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বৃটিশ আমলে ইনকাম ট্যাক্সের অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার। বেথুন কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি.এ পাস করার পর নিজের আগ্রহে সাংবাদিকতায় এম.এ করেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সাংবাদিকতা জগতে কিছুদিন সম্মানের সঙ্গে কাজ করেছেন পি টি আই সংবাদসংস্থা ও বসুমতী পত্রিকা কার্যালয়ে। কিন্তু বিধির বাঁধন ভাঙার সাধ্যি কারোর নেই। তাই হঠাৎ করেই জীবনের মোড় ঘুরে গেল আইনের দিকে। জীবনের প্রতিজ্ঞা ছিল 'বিয়ে করব না', 'স্বনির্ভরশীল হব'। ফলেই আইন নিয়ে পড়াশোনা করে বাবার কাছে কিছুটা অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৯৬১-র ১৯ জুন হাইকোর্টে নাম নথিভুক্ত হয়। আইনজ্ঞ জীবনের প্রথমেই মাননীয় আইনজীবী স্বর্গত ভবেশচন্দ্র মিত্রকে পেয়েছিলেন সিনিয়র উকিল হিসেবে। তাঁর কাছে পরবর্তীক্ষেত্রে হাতে কলমে আইনশিক্ষা এবং কোর্টে স্বাবলম্বীভাবে সওয়াল করা। এরপর

অনুকূল- প্রতিকূল নানা পরিবেশের মধ্য দিয়ে আজ আইন জীবনের পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে এলেন তাঁর কাছে মনে হয় না কখনও 'পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ', আজও মনে করেন পেরোতে হবে অন্তবিহীন দীর্ঘ পথ। সাতাত্তর বছরেও তিনি বলিষ্ঠ তাঁর যুক্তিতে, তাঁর লক্ষ্যে। কখনও কারও কাছে মাথা নত করেননি। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ন্যায়ত তাঁর বিচার। মূলত তিনি দেওয়ানি মামলার বিচার করেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের আইনজীবী জীবনে তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ হলো, আইন, সংবিধানের ওপর যেসব ইংরেজিতে লেখা তথ্যবহুল প্রশ্ন আছে, তার বাংলায় অনুবাদ করা। মূলত, আমরা তাঁকে এক কথায় বলতে পারি জার্নালিস্ট ল' ইয়ার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'স্বস্তিকা' পত্রিকার 'অঙ্গনা' পাতায় তিনি নিয়মিত লিখে থাকেন।

আইনজীবনের পাশাপাশি তিনি একজন সমাজ সেবিকা। বিশেষত নারী ও শিশুদের কল্যাণে তিনি নানাবিধ সমাজসেবা করে থাকেন। অরবিন্দ নারী চেতনা ও চিন্তা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর 'নারীর স্বাধিকার' বইটির জন্যে এই সংস্থার পক্ষ থেকে সম্বর্ধিত হন। এস ও এস ভিলেজেও তিনি সদস্যা। শিশু ও দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ১৯৪৬-এ গড়ে ওঠা 'ঝাঁসিরাণী' বাহিনীর তিনি বর্তমান চেয়ারম্যান। এছাড়া বিনামূল্যে রোগীর সেবায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় নিয়মিত ব্যস্ত। সম্প্রতি উইমেন্স কলেজে স্টেট লিগাল সার্ভিসেস অথরিস্ট' যা দিল্লীর সঙ্গে যুক্ত সেখানে আইনি পরামর্শ দেন। আইনী সহায়তা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধানও করেন।

ব্যস্ত জীবনে প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা চিরঅমলিন। গাছপালা চর্চা নিয়মিত কাজ। ঈশ্বরানুরাগী অরুণা মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁর চণ্ডীপাঠ ছিল শ্রোতাদের বিশেষ পাওনা। মানুষকে ভালবাসা, ঈশ্বরে নির্ভরতা তাঁর জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়ার মূল মন্ত্র।

আয়কর বিভাগের ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

কলকাতার আই সি সি আর-এর সত্যজিৎ রায় প্রেক্ষাগৃহে এক চিত্তাকর্ষক 'হেরিটেজ ক্যুইজ' অনুষ্ঠিত হলো। আয়কর বিভাগের ১৫০ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত এই ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল কলকাতা ও শহরতলির প্রায় ৪০টি স্কুল। কলকাতা দূরদর্শনের জনপ্রিয় আন্তঃস্কুল ক্যুইজ প্রতিযোগিতা—'যোগ-বিয়োগ' খ্যাত ক্যুইজমাস্টার রাজীব সান্যালের অনবদ্য পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। প্রখ্যাত অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী অডিও রাউন্ডটি পরিচালনা করেন। তাঁর উপস্থিতিতে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীরা অত্যন্ত অনুপ্রাণিত বোধ করে। তিনিই বিজয়ী ও সকল প্রতিযোগীর হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেন। এই ক্যুইজে অনেক অভিনব রাউন্ডের অবতারণা করেন ক্যুইজমাস্টার ও তাঁর টিম। ছিল অডিও, ভিস্যুয়াল (হেরিটেজ-আই) কানেকশন (হেরিটেজ কানেক্ট) ও ইনকাম-ট্যাক্স রাউন্ড। ডন বসকো লিলুয়া, ১৭০ পয়েন্ট নিয়ে বিজয়ীর শিরোপা ছিনিয়ে নেয়; লা মার্টিনিয়র ফর বয়েজ ও সেন্ট টমাস বয়েজ স্কুল, খিদিরপুর যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ডন বসকো লিলুয়ার অভিরূপ দে শ্রেষ্ঠ ক্যুইজার মনোনীত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ-এর রাজ্যপাল এম কে নারায়ণন। উপস্থিত ছিলেন মাননীয় চিফ কমিশনার বি এস সোন্ধী, শ্রীমতী ব্রততী মুখোপাধ্যায় ও আয়করের বহু পদস্থ আধিকারীকরা।

তিনবিঘা নিয়ে বিজেপি-র কালাদিবস

গত ২৬ জুন প্রতিবছরের মতো এবারও ভারত ভূখণ্ড 'তিনবিঘা'-কে বাংলাদেশের হাতে হস্তান্তরের প্রতিবাদে বিজেপি-র পক্ষ থেকে মেখলিগঞ্জে কালা দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে সংগঠনের রাজ্য সহ-সভাপতি তাপস চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী, রাজ্য- সম্পাদক দীপেন প্রামাণিক ও জলপাইগুড়ি জেলার নেতৃবৃন্দ তিনবিঘায় সমাবেশ করে অবিলম্বে ছিটমহল বিনিময়, তেঁতুলিয়া করিডর চালু, তিনবিঘা আন্দোলনে আহত ও নিহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানায়। সমাবেশে ৫০০-রও বেশি মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তিনবিঘা আন্দোলনের শহীদ জিতেন্দ্র ক্ষীতেন ও সুধীর রায়ের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে কিছু অর্থ-সাহায্য ও বস্ত্র প্রদান করা হয় বিজেপি-র তরফ থেকে।

রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা

গত ৪ জুন দক্ষিণ কলকাতায় সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে নৃত্য-গীত আলেখ্য সহযোগে পালিত হলো রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা। শিল্পী ইন্দ্রাণী দত্তের নজরুল গীতি এবং শাখার প্রাক্তন সভানেত্রী শিল্পী রুমা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিবেশন অনুষ্ঠানে অন্য মাত্রা যোগ করে।

'বলিদান দিবসে'র দাবি

গত ২৩ জুন ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ৫৮তম বলিদান দিবস উদ্‌যাপিত হয় উত্তর ২৪ পরগনার জগদ্দল কলোনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হল ঘরে, স্বামী বিবেকানন্দ ও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি উদ্যোগ মঞ্চের পক্ষ থেকে। মঞ্চের পক্ষ থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন ৬ জুলাইয়ে বিধানসভা ভবনের দেওয়ালে তাঁর প্রতিকৃতি রাখার দাবি জানানো হয়েছে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন আর এস এসের বরিষ্ঠ প্রচারক কেশব রাও দীক্ষিত। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন আই টি আইয়ের প্রাক্তন শিক্ষক সুনীলচন্দ্র মিত্র। অনুষ্ঠানে মঞ্চের পক্ষ থেকে রাজ্য টেবিল টেনিস

সমাবেশ সমাচার

প্লেয়ার একাদশ শ্রেণীর ছাত্র দেবদীপ বসুকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মঞ্চের প্রদেশ সভানেত্রী গায়ত্রী কর, সম্পাদক সুনীল কুমার দে, শ্যামল বণিক প্রমুখ।

মঙ্গলনিধি

গত ১০ জুলাই হুগলির হরিপালে রাধাবল্লভপুর গ্রামে আর এস এস-এর হরিপাল মহকুমার ব্যবস্থা প্রমুখ রাজকুমার সাঁতরা তাঁর কন্যা ভাগ্যশ্রী-র শুভ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে মঙ্গলনিধি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সমাজসেবা ভারতীর সেবা কাজের জন্য ৩০০০ টাকা তুলে দেন সঙ্ঘের মশাটখণ্ড বৌদ্ধিক প্রমুখ মানস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে।

***

মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুরে উদয় ঘোষ তাঁর পুত্র রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক উৎপল ঘোষের বিয়ের বৌভাত উপলক্ষে গত ২১ জুন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পরাবর্তনের কাজের জন্য ২০০১ টাকা মঙ্গলনিধি দান করেন মঞ্চের মুর্শিদাবাদ বিভাগ প্রমুখ বিশ্বনাথ সাহা-র হাতে।

রক্তদান শিবির

হুগলি ভারতমাতা সেবা সঙ্ঘের উদ্যোগে রথযাত্রার দিন গত ৩ জুলাই শ্রীরামপুর স্টেশন সংলগ্ন কম্পিউটারাইজড কাউন্টারের সন্নিকটে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্মরণে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রত্না দে নাগ। শিবিরে রক্তদাতার সংখ্যা ৩৭। রক্তদান ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুপরিচিত জাতীয়তাবাদী লেখক, প্রাক্তন আই এ এস আধিকারিক ড. প্রীতিমাধব রায়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক ডা: সুদীপ্ত রায়, জয়দেব নাগ, ডা: চুনীলাল চক্রবর্তী, ডা: মোতিলাল চ্যাটার্জী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

সংখ্যালঘুত্ব

পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর হৈদরাবাদের প্রেস ক্লাব সম্প্রতি এক অদ্ভুত দৃশ্যের সাক্ষী থাকিয়াছে। এক হিন্দু দম্পতি মুকেশ ও পদ্মা সর্বসমক্ষে অগ্নিসাক্ষী করিয়া পরস্পর সাত পাকে বাঁধা পড়িয়াছেন। অনুষ্ঠানটি বিবাহের হইলেও তাহাতে কোনও জাঁকজমক ছিল না। বধূগৃহে না হইয়া প্রেস ক্লাবের সামনে ইহা অনুষ্ঠানের কারণ পাকিস্তানের আইনপ্রণেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। সেই সঙ্গে সমগ্র বিশ্বেরও যে, পাকিস্তানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিবাহ নথিভুক্তির কোনও আইন নাই। মুকেশ-পদ্মার সাংবাদিক-লাঞ্ছিত বিবাহ-অনুষ্ঠান এই বঞ্চনার প্রতিকার চায়, ১৯৪৭ সাল হইতে যাহা নাগাড়ে চলিয়া আসিতেছে।

অথচ 'কায়েদ-এ-আজম' মহম্মদ আলি জিন্না যখন পাক গণপরিষদে তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণ দিয়াছিলেন, তখন তিনি পাকিস্তান বলিতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের স্বপ্ন ফেরি করিয়াছিলেন, যেখানে প্রতিটি সম্প্রদায়ের স্বাধীন ধর্মাচরণ ও সামাজিক প্রথাপালনের অধিকার থাকিবে এবং রাষ্ট্র কোনওভাবে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না। তবে জিন্নার সেই ভাষণ বোধহয় অন্য সকলকে শুনাইবার এবং পাকিস্তানে বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের তখনকার মতো আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হইয়াছিল। অন্যথায় পাকিস্তানের ৩৪ লক্ষ হিন্দু সংখ্যালঘুর প্রতি আজও এই রাষ্ট্রীয় বৈষম্য কেন? স্বীকৃতি না থাকায় অবিবাহিত হিন্দু মহিলাদের কোনও সামাজিক সুরক্ষা বা আইনগত রক্ষাকবচ নাই, তাহাদের যথেচ্ছ অপহরণ করিয়া ধর্মান্তরিত করা যায় এবং মুসলিমরা ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওই মহিলাদের বিবাহ করিতে পারে। শুধু তাহাই নহে, স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকার অর্জনও হিন্দু বিধবাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া ওঠে।

সংখ্যালঘুর প্রতি এই ধরনের বৈষম্য অনুশীলনের বীজটি অবশ্য পাকিস্তান আন্দোলনের জন্মলগ্নেই উপ্ত ছিল। জিন্না হিন্দু-গরিষ্ঠ ভারতে মুসলিমদের উপর হিন্দু আধিপত্য বরদাস্ত না-করার যুক্তিতে পাকিস্তান চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবিত মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র পাকিস্তানে সংখ্যালঘুরা কী ভাবে থাকিবে, তাহার রূপরেখাও তিনি বাঁধিয়া দেন; 'সংখ্যালঘুরা তখন নিজেদের সংখ্যালঘুত্ব মানিয়া লইবে, স্বীকার করিবে কেবল সংখ্যালঘু রূপেই তাহারা থাকিতে পারে, আধিপত্যকারী হিসাবে নয়'। ইহার পরেও জিন্না আশা করিয়াছিলেন, পাকিস্তানের মুসলিমরা সেখানকার সংখ্যালঘুদের সহিত উদার আচরণ করিবে! কেন করিয়াছিলেন, তিনিই জানেন। কেননা 'নিজেদের সংখ্যালঘুত্ব মানিয়া লওয়া'র মধ্যে বৈষম্যকে শিরোধার্য করার যে বাধ্যতা নিহিত রহিয়াছে, তাহা কখনও সমমর্যাদার দাবিদার হইতে পারে না। হিন্দুরা যে পাকিস্তানের জন্মের ৬৪ বছর পরেও মুসলিমদের সমান আইনগত সুরক্ষা ও সাম্যের অধিকারী নয়, বরং চরম বৈষম্য ও অসাম্যের শিকার, তাহা কেবল জিন্না-উত্তর পাক রাজনীতিকদের বিচ্যুতি বা পথভ্রষ্টতার কারণে নয়। জিন্নার কল্পরাষ্ট্রচিন্তার মধ্যেই অমুসলিম প্রজাদের প্রতি মুসলিম রাজশক্তির বৈষম্যমূলক রাজধর্মের আভাস লুকাইয়া ছিল। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হাতে পাইয়া পাক শাসকরা সেই রাজধর্ম অনুশীলন করিয়াছেন মাত্র। মুসলিম সম্প্রদায়েরই অন্যান্য অ-সুন্নি অংশ শিয়া ও আহমদিয়াদের প্রতি সুন্নি গরিষ্ঠ পাক সমাজ যে নৃশংসতা ও বর্বরতা অনুশীলন করিয়া থাকে, তাহার মধ্যেও সংখ্যাগুরুর সেই আধিপত্যকামিতাই প্রকট, যাহার হাত হইতে মুক্তি পাইতে জিন্না হিন্দুস্তানকে বিভক্ত করেন।

(সৌজন্যে : আনন্দবাজার পত্রিকা। গত ১৪ জুলাই সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত লেখাটির বানান ও ভাষা হুবহু রেখে প্রকাশ করা হলো।)

সংখ্যালঘুর প্রতি এই ধরনের বৈষম্য অনুশীলনের বীজটি অবশ্য পাকিস্তান আন্দোলনের জন্মলগ্নেই উপ্ত ছিল। জিন্না হিন্দু-গরিষ্ঠ ভারতে মুসলিমদের উপর হিন্দু আধিপত্য বরদাস্ত না-করার যুক্তিতে পাকিস্তান চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবিত মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র পাকিস্তানে সংখ্যালঘুরা কী ভাবে থাকিবে, তাহার রূপরেখাও তিনি বাঁধিয়া দেন; 'সংখ্যালঘুরা তখন নিজেদের সংখ্যালঘুত্ব মানিয়া লইবে, স্বীকার করিবে কেবল সংখ্যালঘু রূপেই তাহারা থাকিতে পারে, আধিপত্যকারী হিসাবে নয়'। ইহার পরেও জিন্না আশা করিয়াছিলেন, পাকিস্তানের মুসলিমরা সেখানকার সংখ্যালঘুদের সহিত উদার আচরণ করিবে!

পাত্র একটি দৈনিক পত্রিকার কোচবিহার জেলার চিফ রিপোর্টার। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক/ শিক্ষিকার কনিষ্ঠ পুত্র (তিলি)। ফর্সা, উচ্চতা ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি এবং বয়স ৩১। উপযুক্ত পাত্রী চাই। যোগাযোগ : ০৩৫৮২-২২৫১৭২

অ্যাথলেটিক্সে অনাচার তিরন্দাজেরা স্বপ্নের ফেরিওয়ালা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

কি পরস্পর বিরোধী অবস্থান! একদিকে ভারতের সেরা কিছু মহিলা অ্যাথলিট কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে গিয়ে বিশ্বসমাজে চুনকালি মাখিয়ে দিয়েছে আর অন্যদিকে ভারতের মহিলা তিরন্দাজেরা ইতালির তুরিনে ইতালির বিরুদ্ধে ফাইনালে তুল্যমূল্য লড়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ থেকে রূপো জিতে ফিরে এল। সামনের বছর এই সময়ে লন্ডনে চলবে বিশ্ব অলিম্পিক। আর যে মহিলা অ্যাথলিটেরা ডোপ টেস্টে পজিটিভ হয়ে সাসপেন্ড হবার মুখে তারাই ভারতের আশা-ভরসা! গত বছর এই মনদীপ কাউর, পূজা শ্রীধরনরা কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান গেমস থেকে দেশকে সোনা এনে দিয়েছেন। ভারতের ৪x৪০০ রিলে দলকে ঘিরে স্বপ্নের জাল বোনা হচ্ছে যে এরা লন্ডনে ফাইনালে উঠতে পারে। আর সেই রিলে টিমের 'অ্যাঙ্করওম্যান' মনদীপই যে থাকবেন না। অন্তত এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি। আর দীপিকা কুমারী, বোম্বাইলাদেবী, চক্রভেলু সুরোরা ভারতের ক্রীড়াসমাজকে এক বিরাট গৌরবপ্রদান করলেন ইতালির আর্চার কোর্সে অসাধারণ পারফরম্যান্স মেলে ধরে। কোচ লিম্বারাম যেতে পারেননি। সহকারি কোচ ও অন্যান্য সাপোর্ট স্টাফরা যেভাবে তাদের গাইড করে, সবদিকে নজর রেখে সেরা পারফরম্যান্স বের করে এনেছেন তারজন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। এই কোচেরা দেশের অলিম্পিক সংস্থা বা সরকারের কাছ থেকে কিছুই পান না। মাস গেলে যে টাকাটা হাতে পান তা ক্রিকেট, ফুটবল, হকি টিমের কোচ ও সাপোর্ট স্টাফদের তুলনায় নগণ্য। প্রধান কোচ লিম্বারাম যিনি একদা বিশ্ববন্দিত তিরন্দাজ, মাস মাইনে হিসেবে পান মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা। তাহলে বাকিদের প্রাপ্তিযোগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা অসম্ভব নয়। অন্যদিকে ভারতের ফুটবল দলের চিফ কোচ আর্মান্দো কোলাসো পান মাসিক তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা তার সঙ্গে 'ফাইভ স্টার' সুযোগ সুবিধে। হকি টিমের চিফ কোচ ছিলেন এই সেদিনও, স্পেনের ফিলিপ ব্রাসা যিনি কিছুই না দিতে পারলেও এক বছরে কামিয়ে নিয়ে গেছেন এক কোটির ওপর।

এই তিরন্দাজেরা কলকাতা সাই কেন্দ্রে সারা বছর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেন। তাদের যে লাঞ্চ ও ডিনার পরিবেশন করা হয় তার গুণগত মান কি? ক'দিন আগেই এই খাবার ইসুতে রীতিমতো বিদ্রোহ করেছিলেন কোচ লিম্বারাম সহ অন্যান্য কোচ, কর্মকর্তারা। তাদের হৈচৈ-এ টনক নড়ে যায় সাই-এর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের। দিল্লি থেকে ছুটে আসেন ডিরেক্টর জেনারেল। দেশের তিরন্দাজ সংস্থার দুই বড় কর্তা বিজেপি সাংসদ বিজয় কুমার মালহোত্রা ও পরেশ মুখার্জির হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয়। তিরন্দাজ আর তাদের কোচেরা বেশ কয়েকদিন বাইরে গিয়ে খেতে বাধ্য হয়েছিলেন। এতটাই নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করা হোত তাদের। অথচ সমস্ত রকম বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও তিরন্দাজেরা সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে বেশি সাফল্য এনেছেন এবং মানের একটা নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই। শ্যুটিংও অবশ্য ইদানিংকালে গর্ব করার অবকাশ দিয়েছে তবে ধারাবাহিকতায় পিছনে ফেলে দিয়েছেন তিরন্দাজেরা। একমাত্র অলিম্পিক পদকটিই অধরা।

রাজ্যবর্ধন রাঠোর রূপো ও অভিনব বিন্দ্রা সোনা এনে দিয়েছেন অলিম্পিক থেকে। তিরন্দাজিতে একটুর জন্য পদক পাননি দোলা ব্যানার্জি ও জয়ন্ত তালুকদাররা। এবার বোধহয় পদক খরা কেটে যাবে। লন্ডন অলিম্পিকে পদক অবশ্যম্ভাবী অন্তত মেয়েদের রিজার্ভ বিভাগে। এই বিভাগে দীপিকা, চক্রভেলু, বোম্বাইলাদেবী যথার্থই বিশ্বমানের এবং প্রথম ২/৩টি দলের মধ্যে আছেন। যদি মাথা ঠাণ্ডা রেখে নিশানায় নির্ভুল থাকতে পারেন তাহলে 'পোডিয়াম ফিনিশ' কোনও অসম্ভব ব্যাপার নয়। আর এখানেই গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে মনোবিদকে। কোচ লিম্বারামের পরামর্শে ফেডারেশন সবসময়ের জন্য একজন মনোবিদ নিয়োগ করছে। টেকনিক ও স্কিলসংক্রান্ত কোনও দুর্বলতা নেই ভারতীয়দের। কোচ ও ট্রেনারও তাদের কাজ ভালরকম করে যাচ্ছে। অলিম্পিকের মতো বিশ্ব মঞ্চ স্নায়ুযুদ্ধেরও বড় পরীক্ষা নেয়। তা উতরোতে গেলে যোগাভ্যাসের পাশাপাশি সাইকো থেরাপির প্রয়োজন যে কাজটা করে দেয় একজন ভালমানের মনোবিদ। এই মনোবিদের ২৪ ঘণ্টা সাহায্য পেয়েই অভিনব বিন্দ্রা চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণে টেক্কা দিয়েছিলেন জবরদস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের বেজিং অলিম্পিকে।

তুরিনে ফ্রান্স, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো হেভিওয়েট দলকে হারানোটা অবশ্যই মনোবল অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছেন দীপিকাদের। তারা বুঝতে পেরেছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে রূপো জেতা তাদের অলিম্পিক পদকের খুব কাছে এনে দিয়েছে অবস্থানের দিক থেকে। আর তাদের দেখেও কেন চৈতন্য হয়না মহিলা অ্যাথলিটদের? তারা তো তিরন্দাজদের তুলনায় অনেক বেশি সুযোগ সুবিধে পান। আর্থিক দিক থেকে যথেষ্ট ভাল জায়গায় রয়েছেন। সব সময়ের জন্য বিদেশী কোচ। ফিজিকাল ট্রেনারের সাহচর্য পান। বিদেশী ও দেশী কোচেরা তাদের কোনও ঔষধ দিলে তা না বুঝে কাউকে না জিজ্ঞেস করে খেয়েই বা ফেলেন কেন? টিমের ডাক্তার বা অন্য কোনও ক্রীড়া বিজ্ঞানীর পরামর্শ নিলে এতবড় কাণ্ড ঘটত না। ভারতীয় ক্রীড়াজগতকেই নড়িয়ে দিয়েছে এই ঘটনা। এর ফলে যদি গোটা ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনকে সাসপেন্ড করে দেয় বিশ্বসংস্থা, তাহলে এদেশের অ্যাথলেটিক্সের ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে যাবে। ভারতের সঙ্গে বিদেশী রাষ্ট্রের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কও ক্ষতিগ্রস্ত হবে? একসঙ্গে এতগুলো অ্যাথলেটিক্স তথা ক্রীড়া সংস্কৃতির দুই শীর্ষকর্তা তিহার জেলে বন্দী, যে দেশে অ্যাথলিটদের শুধু দোষ দিয়েই বা কি হবে। সংসদভবন থেকে ক্যাবিনেট সর্বত্র দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার ছেয়ে গেছে, তারই প্রভাব পড়েছে খেলার মাঠে। তার মধ্যেও আশা, স্বপ্নের দিক-দর্শন ঘটায় তিরন্দাজ, শ্যুটারেরা।

শব্দরূপ-৫৯০ সুপর্ণা ভদ্র

১		২	■	■	৩		৪
■	■	৫	৬			■	
■	৭	■		■	■	■	
■	৮			■	■	৯	
১০		■	■	১১			■
	■	■	■		■		■
	■	১২			১৩	■	■
১৪			■	■	১৫		

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. স্ত্রীর নামের পরিচয় নিয়ে শিব, **৩.** নীহার, হিম, নিশাজল, **৫.** চাঁদ, চন্দ্র, **৮.** হিমালয়-পত্নী, স্বর্গের অপ্সরাবিশেষ, **৯.** হাতি, দাবার ঘুঁটি বিশেষ, **১০.** শ্রীফল, এই গাছের পাতা পূজাতে লাগে, **১১.** চিন্তা, বিবেচনা, উদ্বেগ, **১২.** চিত্রাঙ্কনাদি সুকুমার শিল্প, শেষ দু'য়ে কদলী, **১৪.** কথা বলা পাখি, **১৫.** রবিঠাকুরের খণ্ডোপন্যাস, প্রথম দু'য়ে পণ্য।

উপর-নীচ : ২. অন্যনামে চন্দ্র, **৩.** বঙ্গীয় বেবি, **৪.** সপ্তপাতালের নিম্নতমটি, **৬.** মারীচের মাতা, **৭.** প্রতিশব্দে মরুতরণী, শেষ দু'য়ে মিলন, **৯.** শিবের ধনুকাকৃতি বাদ্যযন্ত্র, **১০.** প্রতিশব্দে বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থা, **১১.** বিশেষণে কল্পনাপটু, চিন্তাশীল, **১২.** ছোলা, **১৩.** তিব্বতীয় বৌদ্ধ পুরোহিত।

সমাধান
শব্দরূপ-৫৮৮

সঠিক উত্তরদাতা

ঘনশ্যাম সিংহ
মিস্ত্রিপাড়া,
বোলপুর, বীরভূম
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

ব	স	না	ঞ্চ	ল	■	■	জ
■	র	■	■	ঘি	■	■	ন
■	স্ব	■	■	মা	ত	ঙ্গি	নী
ব্য	তী	ত	■	■	প	■	■
■	■	ব	■	■	ন	র	ক
স	ং	লা	প	■	■	ঙ্গ	■
ন	■	■	র	■	■	র	■
কা	■	■	ব	স	ন্ত	স	খ

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৯০ সংখ্যার সমাধান আগামী ৮ আগস্ট, ২০১১ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা।। সর্প যজ্ঞ।। ১৩

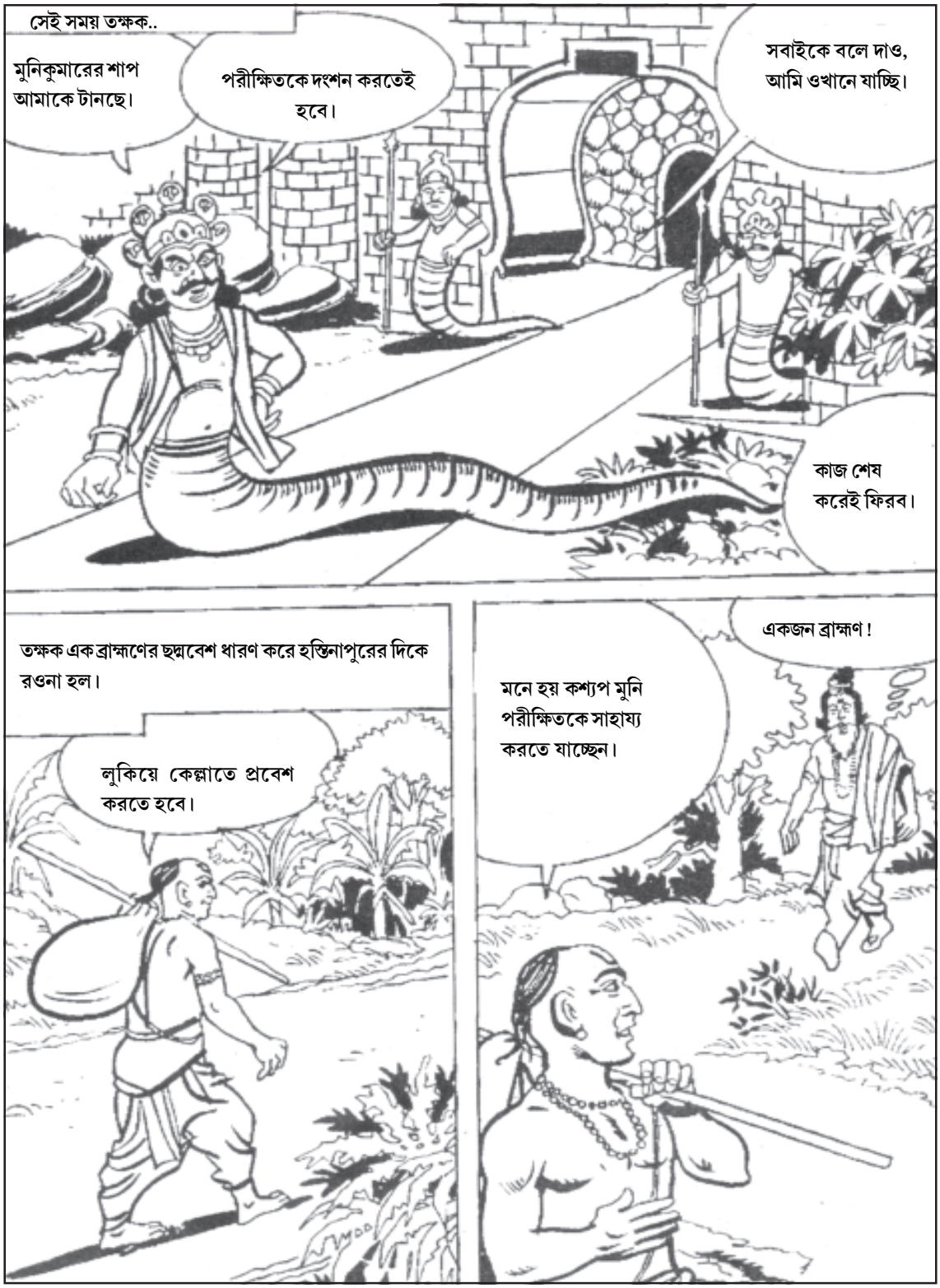

Swastika RNI No. 5257/57
25 July - 2011
Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

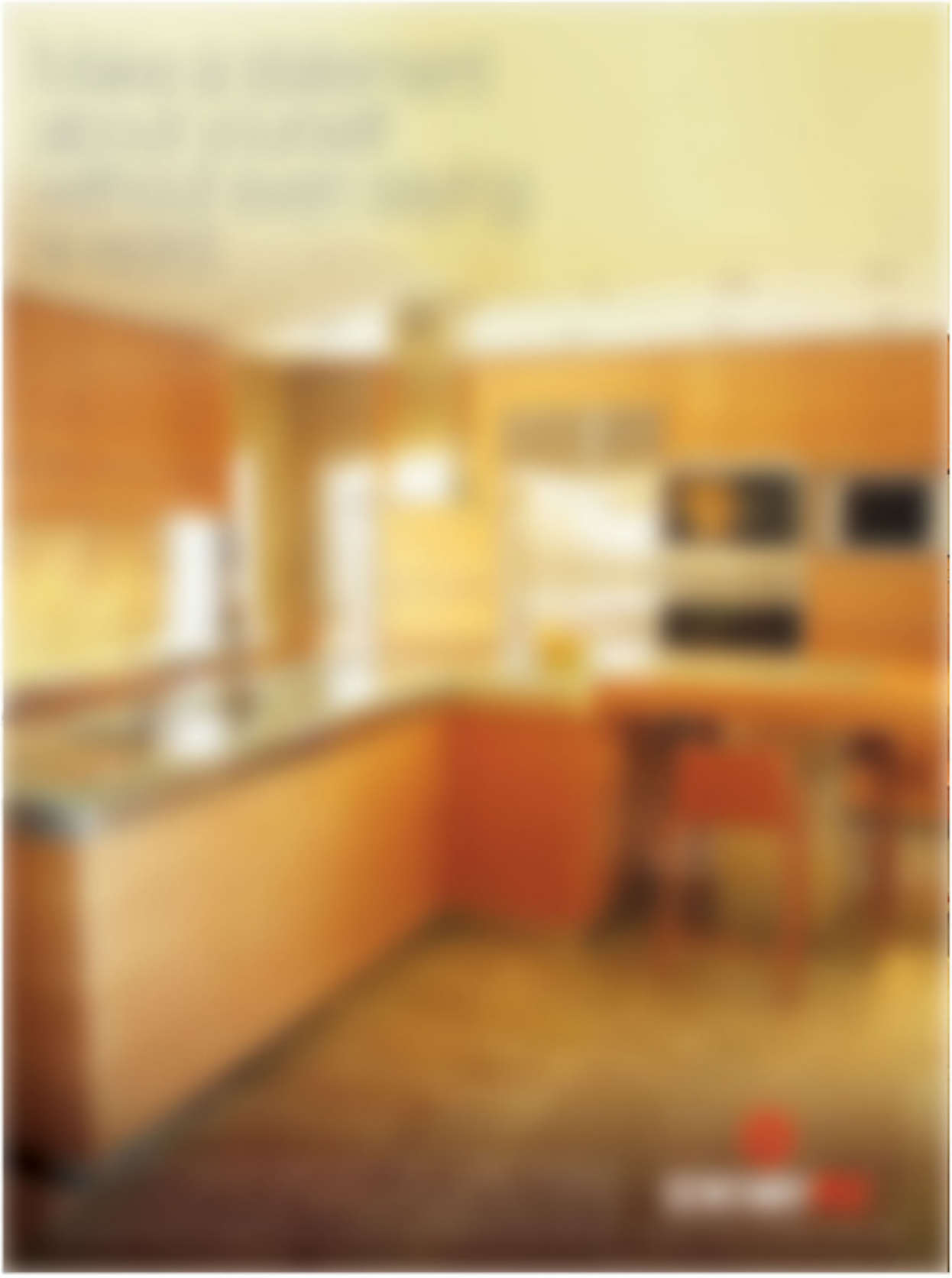

দাম : ৫.০০ টাকা